মানুষ কি করে বড় হল

মিখাইল ইলিন

অনুবাদক

গিরীন চক্রবর্ত্তী

পূরবী পাবলিশার্স

কলিকাতা

কিশোর-কিশোরীদের হাতে

ভূমিকা

বর্ত্তমান বইটি মিখাইল ইলিনের "How Man Became a Giant-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। আদিম যুগ থেকে শুরু করে বিবর্ত্তনের নানা স্তরের ভেতর দিয়ে মানুষ আজ কেমন করে সারা বিশ্বময় কর্ত্তৃত্ব করছে খুব অল্প কথায় সে বিরাট ইতিহাস রূপকথার মত করে এই বইটিতে বলা হয়েছে। বইটিও তাই সোভিয়েট দেশের কিশোর-কিশোরীর কাছে অত্যন্ত আদরের।

অযথা ভূতপ্রেতের কাহিনী দিয়ে তাদের মন ভারাক্রান্ত না করে বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে কিশোরদের পরিচয় ঘটানো দরকার। ইলিনের লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে, দুর্বোধ্য বিষয়ও কত হৃদয়গ্রাহী করে কিশোরদের পরিবেশন করা সম্ভব!

তাঁরই অনুসরণে বাংলার কিশোরদের হাতে দেবার জন্যে যথাসাধ্য সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় 'মানুষ কি করে বড় হল' লিখতে চেষ্টা করেছি। এরকম বই-এর একান্ত প্রয়োজন ছিল বলেই সাহস করে এগিয়েছি। কতদূর সফল হয়েছি বলতে পারি না। প্রচুর ছবি দিয়ে বইটি সমৃদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি।

বন্ধুবর স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে এ দুরূহ কাজ সম্ভব হত না। শিল্পী সূর্য্য রায় বইএর বহু ছবি এঁকে সাহায্য করেছেন। প্রচ্ছদপট-শিল্পী হচ্ছেন আমার তরুণ বন্ধু রবীন চন্দ।

মানুষ-দৈত্য

এই পৃথিবীতে একজন দৈত্য আছে জানো ?

—তার হাতে এত জোর যে, অক্লেশে সে বড় বড় রেলগাড়ী টেনে উপরে তুলতে পারে।

—তার এমন পা যে, সে এক দিনেই হাজার হাজার মাইল দূরে যেতে পারে।

—তার পাখা এমন যে সে ইচ্ছে করলেই মেঘের উপর দিয়ে পাখীদের চাইতেও উঁচুতে উড়ে যেতে পারে।

—তার এমনি সুন্দর ডানা যাতে করে সে যে-কোনও মাছের চেয়ে ভালভাবে জলের উপরে কিংবা জলের নীচে অনায়াসে সাঁতার কাটতে পারে।

—যা দেখা যায় না এমন সব জিনিসও তার চোখে ধরা পড়ে।

—পৃথিবীর এক প্রান্তের কথা আর এক প্রান্তে বসেও সে শুনতে পারে।

—তার গায়ে এতই জোর যে, সে সোজা পাহাড়ের ভেতর ঢুকে যেতে পারে—আর ইচ্ছে করলে বড় বড় জলপ্রপাতও মাঝপথে থামিয়ে দিতে পারে।

—সে নিজের সুবিধামত পৃথিবীকে তৈরী করে নেয় —জঙ্গল কেটে ফলফুল-শাকসব্জীর বাগান করে, এক সমুদ্রের সঙ্গে আর এক সমুদ্রকে যোগ করে দেয়—মরুভূমিতেও জল দিয়ে তাকে শস্য-শ্যামল করে তোলে।

—তোমরা বলবে ঃ কে এই দৈত্য! তাই না?

—সে দৈত্যই হচ্ছে **মানুষ**।

মানুষ কেমন করে এত বড় দৈত্য হয়ে দাঁড়াল?

এ বইতে সে কথাই তো আমরা বলব।

অদৃশ্য খাঁচায়

এমন একদিন ছিল যখন সত্যি মানুষ দৈত্য ছিল না। সে ছিল খুব ছোট্ট—একেবারেই বামন। আশেপাশে চারদিকের কোনও কিছুর উপর তার কোথাও এতটুকু কর্তৃত্ব ছিল না—সে ছিল তাদের অনুগত দাস মাত্র!

যে-কোনও পশুপাখীর মতই প্রকৃতির উপর তার কোন জারিজুরি খাট্‌তো না। এক কথায়, বিন্দুমাত্র স্বাধীনতাও তার ছিল না।

তোমরা বলবে: কেন স্বাধীনতা ছিল না? ইচ্ছে মত কাঠবিড়ালী কি এক গাছ থেকে আর এক গাছে দৌড়য় না? সে তো আর খাঁচায় আট্‌কে নেই! কাঠঠোক্‌রা গাছ ঠোকরায় বলে কি সেই গাছের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে?

কথাটা শুনতে হাসি পায়, না? কারণ সত্যিই তো কেউ কাঠবিড়ালী কি কাঠঠোক্‌রাকে খাঁচায় ধরে রাখেনি!

তবু এরা সব অদৃশ্য খাঁচায় ধরা পড়েছে—কেউ কোন দিন সে খাঁচা দেখতেও পাবে না। এমন একদিন ছিল যখন মানুষও ঐ রকম অদৃশ্য খাঁচায় আর শেকলে বাঁধা ছিল। যদি দেখতে চাও কি রকম খাঁচায় আর শেকলে মানুষ বাঁধা থাকতো এবং কেমন করেই বা তারা শেকল ভেঙে বেরুল—তা হলে বনেজঙ্গলে মানুষের যে-সব বন্দী কুটুম্ব রয়েছে তাদের অবস্থা দেখলেই বুঝতে পারবে। কাজেই মানুষের কথা বলবার আগে এই বইয়ে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারের কথা বলতে হবে।

পাখীর মত স্বাধীন

লোকে কথায় কথায় বলে, "পাখীর মত স্বাধীন" ; কিন্তু তোমরা কি সত্যি মনে কর যে কাঠঠোক্‌রা স্বাধীন ? স্বাধীন হলে তো সে যেখানে খুশী যেতে পারত আর যেখানে ইচ্ছে বাস করতে পারত। কিন্তু কাঠঠোক্‌রাকে একবার বড় বড় গাছ-না-থাকা জায়গায় চালান দিয়ে দেখ না। সে মরে যাবে।

গাছ না হলে সে থাকতে পারে না। সে যেন এক অদেখা শেকলে গাছের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে।

শুধু কাঠঠোক্‌রা কেন, আরও নানান পাখী আছে যারা এমনি না-দেখা শেকলে বাঁধা পড়ে আটকা রয়েছে। তাদের চারপাশে যেন দেয়াল ঘেরা, তার বাইরে উড়ে যাবার ক্ষমতা তাদের নেই।

বনেজঙ্গলে বেড়ান

বনেজঙ্গলে বেড়াতে গেলে পথে এ-রকম অদৃশ্য দেয়াল বহু নজরে পড়বে। চিড়িয়াখানার মত প্রত্যেক জঙ্গলই অমনি নানা রকমের খোঁয়াড় আর খাঁচায় ভরতি।

জঙ্গলে ঢুকলেই দেখবে, আস্তে আস্তে জঙ্গলের রূপ বদলাচ্ছে। কখনো 'ফার' গাছের মধ্যে রয়েছো—কখনো দেখবে একটু পরে তোমার চারপাশে পাইন গাছের ঝাড়—কোনটা ছোট, কোনটা বড়।

খালি-খালি ঘুরে বেড়াবার জন্যে জঙ্গল দেখে বেড়ালে তেমন কিছু নজরে পড়বে না। কিন্তু কোনও অভিজ্ঞ লোককে

জিজ্ঞেস করলেই তিনি বলে দেবেন, এগুলো সব ভিন্ন ভিন্ন জঙ্গল। চিড়িয়াখানার মত যদি নানা রকম চিহ্ন ঐ সব জঙ্গলে এঁটে দিতে পারা যেত, তাহলে দেখতে 'ফার' জঙ্গলে থাকে শুধু কাঠঠোক্‌রা, কাঠবিড়ালী, কেঠো ইঁদুর—আরও নানারকম জীব। আবার পাইন জঙ্গলে পাওয়া যেত থ্রাস পাখী, চক্কর-দেওয়া কাঠঠোক্‌রা—এই সব।

প্রত্যেক জঙ্গলই মস্ত বড় খাঁচার মত। তারই মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট খোঁয়াড়। বড় বড় বাড়ী যেমন দু-তিন তলা হয়—তেমনি আবার জঙ্গলও ভিন্ন ভিন্ন তলায় ভাগ করা থাকে। যেমন ধর, পাইন গাছের জঙ্গল। প্রায়ই তা দোতলা, বড়জোর, তিনতলা হয়। একতলায় থাকে ঘাস আর শেওলা। ছোট ছোট ঝোপ আর আগাছা থাকে দোতলায়। তিনতলায় থাকে খাঁটি পাইন। বড় বড় ওক গাছ হয়তো সাততলাও হয়। একেবারে উঁচু সাততলা থেকে ওক গাছ নীচে পাতা মেলে জঙ্গলে ছায়া দেয়। বর্ষাকালে সে সবুজ—আর শরৎকালে নানা রং-এর পাতায় ভরতি। ওক গাছের মাঝামাঝি থাকে জংলা আপেল, নয়তো ডালিমের গাছ। আরও নীচে পাঁচ-তলায় থাকে হেজেল ঝোপ, হথর্ণ গাছ, আরো অনেকে। এর নীচে থাকে ঘাস আর ফুল। এ-গুলোও আবার কয়েক তলায় ভাগ করা। সবার উপরে অর্থাৎ আমাদের হিসেব মত চার তলায় থাকে 'বেল' ফুল; তিনতলায় ফার্ণ গাছের ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ে-লিলি ফুল ফোটে; দোতলায় ফোটে ভায়োলেট্ ফুল

—আর একতলায় থাকে পাতাওয়ালা শেওলা। একতলারও নীচে থাকে গাছের গুঁড়ি! এসব ভিন্ন ভিন্ন তলায় প্রত্যেকটিতে আলাদা ভাড়াটে আছে। সবার উপরে সাততলায় থাকে চিল, আরও নীচে থাকে কাঠঠোক্‌রা, পাঁচতলায় থাকে যত সব গাইয়ে ভাড়াটে। পাঁচতলার পাখীরা গোটা জঙ্গল তাদের কাকলি আর শিসে ভরিয়ে রাখে। একতলার ভাড়াটে হচ্ছে জংলা মোরগ। তারা মাটিতে চরে বেড়ায়। একতলারও নীচে মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে থাকে মেটে ইঁদুর।

এই বিরাট সাততলা বাড়ীর এক-এক তলা আবার এক-এক রকম। সাততলায় খুব আলো-হাওয়া। একতলা তেমনি অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে। শীতকালে থাকবার জন্যে মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়তে হয়। মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়লে দেখবে, খুব শীতের সময়েও গর্ত্তের ভেতরে বেশ গরম। ওক গাছের কাণ্ড খুব ঠাণ্ডা। শীতের সময় সেখানে কেউ থাকলে জমে যাবে—কাজেই গরমের সময় ওখানে বেশ আরাম। এ-সব জায়গায় পেঁচা, বাদুড় অনেক থাকে। দিনের বেলা তারা কোনও রকমে ঝিমিয়ে কাটিয়ে দিয়ে রাতের বেলায় চরতে বার হয়।

বাইরে মানুষ প্রায়ই বাড়ী বদল করে—কিন্তু জঙ্গলের জীবেরা তা পারে না। কারণ আগেই বলেছি। জঙ্গলের জীবেরা কেউ স্বাধীন নয়—তারা সবাই বন্দী! তারা যেখানে থাকে সেটাই তাদের জেলখানা। নীচের জংলা মোরগ সেই ঠাণ্ডা

স্যাঁতসেঁতে একতলা ছেড়ে কখনো উপরের আলো-বাতাসে যেতে পারবে না।

কিন্তু কেন এমন হয় বলতে পার? কেন সব জংলা জীব আপন আপন জঙ্গলের খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকে? কেউ নিজের খাঁচা ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে থাকতে পারে না কেন?

ফার গাছের পাখী ক্রসবিলের সঙ্গে মোলাকাৎ
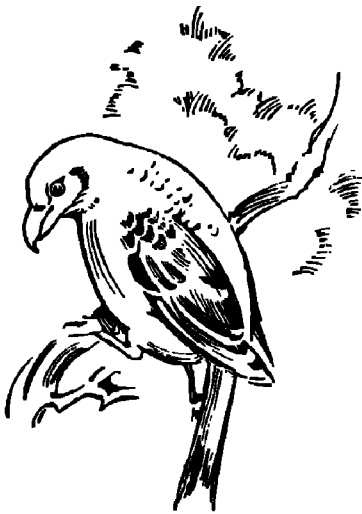
ফার গাছের ক্রসবিল পাখী কি ভাবে থাকে, খায় আর দিন কাটায় এবার দেখা যাক। তার সঙ্গে দেখা করার সব চেয়ে ভাল সময় হচ্ছে সকালে—জলখাবার সময় কিংবা দুপুরের খাবার সময়। অবশ্য কখন যে তার জল খাবার সময় শেষ হয়ে দুপুরের খাবার সময় হয় তা বলা খুব কঠিন। খাবার জন্যে আমাদের চাইতে তার অনেক বেশী সময় লাগে।

ক্রস্‌বিল পাখী সাহেবের মত খাবার সময় ছুরি আর কাঁটা ব্যবহার করে না। তার যন্ত্রপাতির মধ্যে সম্বল হচ্ছে একজোড়া সুন্দর সাঁড়াশি। তাই দিয়ে সে শক্ত শক্ত বাদাম অনায়াসে

ভেঙে ভেতরের শাঁস খেতে পারে। আর এ যন্ত্র তার হারিয়ে যাবার ভয় নেই—নিজের ঠোঁটই হচ্ছে তার সাঁড়াশি। হাজার হাজার বছর ঐ ফার গাছে থাকার ফলে ফার-বাদাম খুব ভাল করে ভাঙবার জন্যে তার ঠোঁট তৈরি করে নিতে হয়েছে। অবশ্য বহুকালের চেষ্টায় ধীরে ধীরে সে সফল হতে পেরেছে। তারপরে ফার গাছেরও তখন তাকে না হলে আর চলে না। কেননা ভাঙা বাদামের টুক্‌রো এদিকে সেদিক না ছড়ালে তা থেকে ফার গাছের চারা গজাবে কেমন করে? আর নতুন নতুন ফার গাছ না জন্মালে ক্রস্‌বিলের বাচ্চাকাচ্চাদেরই বা চলবে কেমন করে? এ জন্যেই ফার গাছ আর ক্রস্‌বিল পাখীর মধ্যে এমন অটুট বন্ধন রয়েছে।

ফার-ক্রস্‌বিল পাখীর যত ইচ্ছেই থাক না কেন, সে তার নিকট-আত্মীয় পাইন-ক্রস্‌বিলের বাড়ী গিয়ে থাকতে পারবে না। এর কারণ, ফার-ক্রস্‌বিলের ঠোঁট শুধু ফার বাদামই যেন ভাঙতে পারে এমনি করে গড়ে তোলা হয়েছে। তা দিয়ে পাইন বাদামের মত শক্ত জিনিস ভাঙা অসম্ভব। পাইন-বাদাম ভাঙা আবার পাইন-ক্রস্‌বিলের একচেটে কাজ। এ জন্যই ফার-ক্রস্‌বিল থাকে ফার গাছে আর পাইন-ক্রস্‌বিল থাকে পাইন গাছে। তারা নিজেদের খেয়াল মত কিছু করে নি। দরকার হয়েছে বলেই তাদের কেউ ফার গাছে থাকছে আর কেউ থাকছে পাইন গাছে।

ওদের যেমন স্বাধীনতাও নেই, তেমনি না খেয়ে মরবার ভয়ও নেই। কিবা গ্রীষ্ম কিংবা শীত, কখনই ফার বা পাইন বাদামের অভাব নেই। শীত কালেও ক্রস্‌বিল পাখীরা ফার গাছ ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না। তাদের খাওয়ার মত প্রচুর বাদাম সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও ফার গাছেই মজুত থাকে!

জঙ্গলের বন্দীরা

ঠিক ঐ ভাবে যদি বনজঙ্গলের প্রত্যেক বন্দীর বিচার করি, তা হলে আমরা দেখব যে, তাদের সবাই নিজের নিজের জঙ্গলে যার-যার তলায় চোখে-দেখার নাগালের বাইরে এমন এক শেকলে বাঁধা পড়েছে যা ভাঙা সহজ নয়।

জংলা মোরগ থাকে একতলায়। কারণ তার খাবার থাকে মাটির নীচে গর্ত্তের মধ্যে। লম্বা ঠোঁট দিয়ে তার পক্ষে মাটির পোকা খুঁটে খাওয়া সোজা। গাছে থাকলে সে যে কি করতো—তা এক সমস্যা। কাজেই জংলা মোরগ কখনই গাছে গাছে বেড়ায় না। তেমনি কাঠঠোক্‌রাও মাটিতে নেমে কি যে করবে তা না জানায় গাছে-গাছেই থাকে। কখনো কখনো কাঠঠোক্‌রা হয়তো সারা দিনই একটি ফার গাছের চারপাশে ঘুরে ফিরে হয়রাণ হয়। তারা কি ঠোক্‌রায় সমস্ত দিন ধরে?

ফার গাছের ছাল যদি তুলে ফেলতে পার তাহলে দেখবে, সেই ছালের নীচেই সমস্ত কাণ্ডের চারপাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা লাইন চ'লে গেছে। ফার গাছের গায়ে একরকম পোকা ঐ লাইন করে। কিছু দূর গিয়েই একটা গর্ত্তের মধ্যে ঐ লাইন শেষ হয়। সেই গর্ত্তে পোকাগুলোর বাচ্চা থাকে। সেই সব বাচ্চা ঐ গর্ত্তেই ক্রমে গুটি থেকে বড় বড় পোকা হয়ে দাঁড়ায়। এই পোকা (উইভিল) ফার গাছেই থাকতে পারে। সেই তার অভ্যাস। আবার কাঠঠোক্‌রারও ঐ উইভিল পোকা না হলে চলে না। ঐ সব গর্ত্তের মধ্যে যেমন করেই পোকার গুটিরা লুকিয়ে থাক না কেন, মস্ত বড় মোটা ঠোঁটের আর জিবের জোরে কাঠঠোক্‌রা সেই গর্ত্ত থেকে তাদের টেনে বার করে নিয়ে আসে।

আমরা এবার পাচ্ছি ঃ ফার গাছ—উইভিল পোকা—কাঠ-ঠোক্‌রা ঃ এই তিন-জোড়া শেকল। বিজ্ঞানীরা এই শেকলকে বলেন "খাদ্য-শৃঙ্খল।" জঙ্গলের বন্দীরা এই শেকলে বাঁধা রয়েছে। মাংসাশী জংলা মার্টেন জন্তুর কথাই ধর। সে জঙ্গলে থাকে কেন? কারণ তার আবার অন্য একটা জংলা জীব কাঠবিড়ালী না হলে চলে না। কাঠবিড়ালী জঙ্গলে থাকে কেন? জঙ্গল ছাড়া তার অন্য কোথাও খাবার মেলে না বলেই। একবার জনকয়েক শিকারী কাঠবিড়ালীর পেট চিরে দেখেছিল, তারা কি খায়। দেখা গেল, তাদের পেটে রয়েছে শুধু ব্যাঙের ছাতা আর ফার বাদাম। তা হলে

এবার আমরা পেলাম ঃ মার্টেন—কাঠবিড়ালী—ব্যাঙের ছাতা —ফার বাদাম।

এভাবে খাদ্য-শৃঙ্খল আরও বাড়িয়ে নেওয়া যায়। মার্টেন ও কাঠবিড়ালী কেন জঙ্গলে থাকে তা তো জানলাম। কিন্তু ব্যাঙের ছাতা কেন গজায়? আমরা অনেকেই তো ছোট বেলায় ব্যাঙের ছাতা তুলেছি। কখনো আমাদের মনে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কি? পশুপাখীর মত ব্যাঙের ছাতাকেও বাধ্য হয়ে জঙ্গলে থাকতে হয় তার খাবারের জন্যে। পচা সব ঘাসপাতা জমা হয়ে থাকে জঙ্গলে আর সেই সবই হচ্ছে ব্যাঙের ছাতার খাদ্য। সেইজন্যেই লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, ব্যাঙের ছাতা যেখানে গজায় সেখানে একটা পচা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ থাকবেই থাকবে। তা হলে আমাদের খাদ্য-শৃঙ্খল আরও বেড়ে গেল। মার্টেন-কাঠবিড়ালী-ব্যাঙেরছাতা-পচা জঞ্জাল। মার্টেন নিজে ব্যাঙের ছাতা না খেলেও অদৃশ্য সূত্রে তার সঙ্গে জড়িত। খাদ্য-শৃঙ্খলের মারফতেই গাছপালারা এক জিনিস থেকে অন্য জিনিসের মধ্যে সূর্য্য থেকে টেনে নেওয়া শক্তি চালান দেয়।

জঙ্গলের বন্দীরা কিন্তু শুধু খাদ্য-শৃঙ্খলেই আট্‌কা নয়। কালিফোর্নিয়ার (আমেরিকার) কাঠঠোক্‌রা ছুটো শেকলে জঙ্গলের সঙ্গে আট্‌কা। প্রথমটা হচ্ছে আহার করা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আহার্য্য মজুত করা —হল্‌দে পাইন-গাছের মধ্যে গর্ত্ত করে সে দুর্দ্দিনের জন্যে খাবার সংগ্রহ করে রাখে। হল্‌দে

পাইনের বাদাম না খেলে ও তার পক্ষে হল্‌দে পাইন না হলে চলবে না।

প্রবেশ নিষেধ

নানা ছোট ছোট জঙ্গল নিয়ে বিরাট জঙ্গল-জগৎ গড়ে উঠেছে। জঙ্গল ছাড়াও পৃথিবীতে রয়েছে ঘাসের মাঠ (প্রেইরী), মরুভূমি, পাহাড়, সমুদ্র—আরও কত কি। প্রত্যেক প্রেইরীতে জঙ্গলের মতই আলাদা আলাদা অনেক রকম অদৃশ্য দেয়াল রয়েছে। সমুদ্রেও জলের নীচে আছে নানা স্তর।

ইয়োরোপের কৃষ্ণসাগরে ঐ রকম আটটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরে যেখানে জল এসে পারের গায়ে ঠেক্‌ছে সেখানে থাকে বার্নাকিল্ নামে একরকম হাঁস, কাঁকড়া—এই সব। তার পরের দোতলায় একটু বেলে মাটিতে থাকে বড় কাঁকড়া আর সুলতান মাছ। শামুক থাকে আরও নীচে। একেবারে সবার নীচে ভরে থাকে বিষাক্ত বাষ্প সালফ্যুরেটেড্ হাই-ড্রোজেন। তাই বলে এটাও ফাঁকা যায় না। এক জাতীয় বীজাণু এই রকম বিষাক্ত জায়গায় থাকা অভ্যেস করে নিয়েছে। অন্য সব জীবের পক্ষে যা বিষ, এদের পক্ষে তাই দরকার।

পৃথিবীতে প্রায় দশ লক্ষ রকমের বা জাতের ভিন্ন ভিন্ন জীব রয়েছে। সবাই নিজের নিজের জগতে চলাফেরা করে। কেউ থাকে জলে, কেউ বা ডাঙায়। কেউ আলো ছাড়া বাঁচতে

৭
৬
৫
সাততলা
৪
ওক্‌গাছ
৩
(ভষ্ঠ পৃষ্ঠায়)
২
১
১
২
৩
কৃষ্ণসাগরের আটটি স্তর
৪
৫
৬
৭
৮
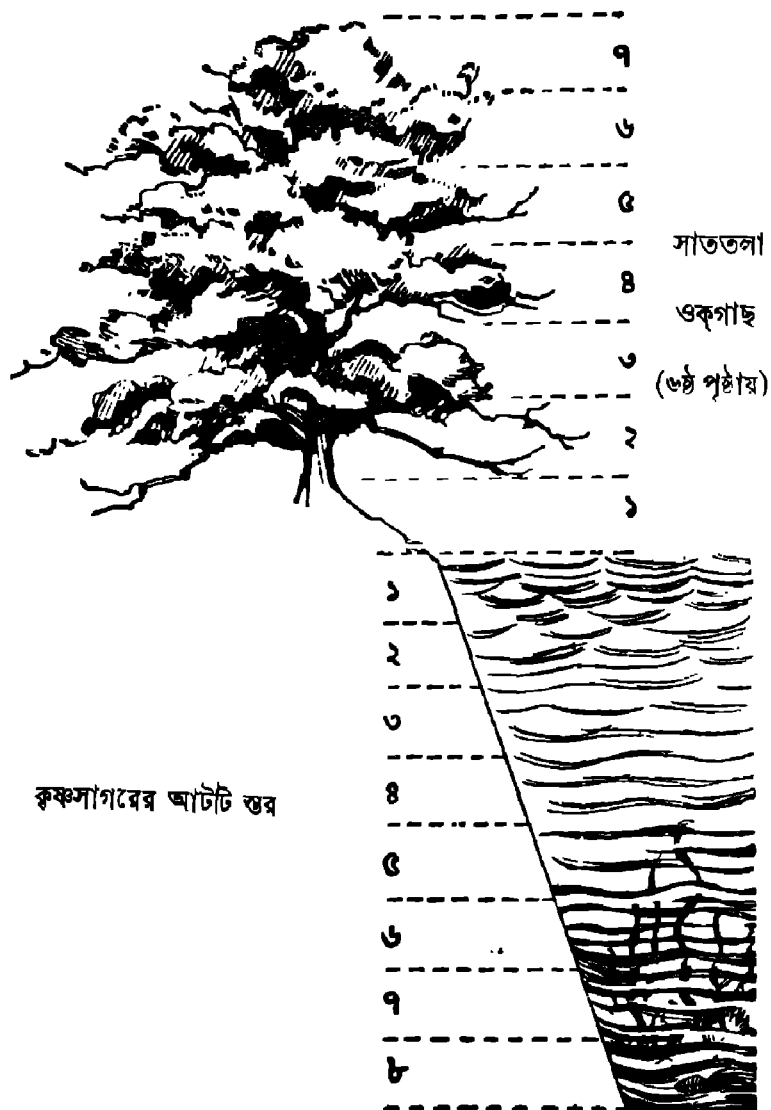
পারে না, আবার কেউ আলো মোটেই সহ্য করতে পারে না। কেউ হয়তো আগুনের মত গরম বালুতে মাথা গুঁজে থাকে, আর কেউ বা ঠাণ্ডা জলা জায়গা ছাড়া আর কোথাও থাকে না। একজনের জন্যে যেখানে 'প্রবেশ নিষেধ' অন্যের জন্যে সেখানে থাকে 'স্বাগতম্'।

যে জায়গায় পাখী টিক্‌তে পারে না—সেখানে থাকে মাছ। গাছের পর গাছ যে জায়গাটা জুড়ে থাকে সেখানে আবার শেওলা হতে পারে ভাল। মোট কথা, এই বিশ্ব সংসারে কোন জায়গাই ফাঁকা নেই। সব জায়গাতেই জীব-জন্তুর বাস।

মেরুদেশীয় ভালুককে যদি আফ্রিকার জঙ্গলে এনে ছেড়ে দাও তো সে তক্ষুনি মরে যাবে। কারণ, তার গায়ে মেরুদেশের শীত সহ্য করার মত পুরু 'ফার' দেওয়া আছে। কিন্তু সে তো গরম সহ্য করতে পারে না! তেমনি এ-দেশের হাতীকে যদি আবার মেরুদেশে চালান করে দাও তার অবস্থাও সঙিন হয়ে দাঁড়াবে। সে হয়তো ঐ প্রচণ্ড শীতে জমে মরেই যাবে।

পৃথিবীতে শুধু একটা জায়গা দেখতে পাবে যেখানে সব দেশেরই জীবজন্তু থাকে! তা হচ্ছে চিড়িয়াখানা।

চিড়িয়াখানায় দক্ষিণ আফ্রিকার পাশেই দেখবে অস্ট্রে-লিয়াকে। অস্ট্রেলিয়া আবার আমেরিকা থেকে কয়েক পা দূরে। পৃথিবীর চারদিক থেকে জীবজন্তুদের এনে সেখানে

জড়ো করা হয়েছে। কেউ নিজে থেকে ইচ্ছে করে সেখানে আসে নি। মানুষই তাদের জোর করে এনে রেখেছে।

এদের জন্যে কি মানুষকে কম কষ্ট করতে হয়! যে জন্তু যেমন আবহাওয়ার মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছে, তার জন্যে ঠিক তেমনি আবহাওয়ার সৃষ্টি করে দিতে হবে। সমুদ্রে যার থাকা অভ্যেস, তার জন্যে জলের পুকুর কেটে দিতে হয়। কারোর জন্যে বালু দিয়ে মরুভূমি তৈরী করা দরকার। এক জন্তু যেন আবার অন্যকে না কামড়ায় তারও বন্দোবস্ত করতে হয়। মেরু ভালুকের চাই বরফের জলে স্নান, আর বানরের দরকার গরম জল। সিংহের রোজ কাঁচা মাংস না হলে চলবে না—আর চিলের জন্যে ডানা মেলে উড়ে বেড়াবার জায়গা চাই। এই সব জীবজন্তুই নিজের নিজের আবহাওয়ায় থাকতে না পারলে মরে যাবে।

তা হলে তোমরা জিজ্ঞেস করবে: মানুষ তো একরকম জন্তু—কিন্তু সে কেমন? সমতলভূমি, না জঙ্গল, না পাহাড়, কোথায় থাকে সে? যে মানুষ জঙ্গলে থাকে তাকে কি 'জঙ্গুলে মানুষ' বলি? আর যে জলাভূমিতে থাকে তাকে কি বলি 'জলো' মানুষ?

না, তা নয়।

কারণ যে-মানুষ জঙ্গলে থাকে সে-ই আবার সমতলভূমি কিংবা পাহাড়েও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারে। মানুষ পৃথিবীর সব জায়গাতেই বাস করে। মানুষের কাছে প্রকৃতিদেবীর

কড়া শাসন চলবে না। তাঁর "প্রবেশ নিষেধের" কোনই দাম সেখানে নেই। সুমেরু আবিষ্কারক পাপিনিন তাঁর দলবল নিয়ে নয় মাস চলন্ত বরফের চাপের উপরে ছিলেন। ঠিক অমনি সাফল্যের সঙ্গে তাঁরা যে জ্বলন্ত মরুভূমির ভেতরেও যেতে পারতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আজকের মানুষের কাছে পৃথিবীতে অগম্য জায়গা কোথাও নেই। কিন্তু সব সময় তা ছিল না।

পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে দেখা

কোটি কোটি বছর আগের জঙ্গল আর আজকের জঙ্গলের মধ্যে ঢের তফাৎ। তখনকার গাছগাছড়া ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। আর তাতে থাকতো সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবজন্তুরা। তখনকার জঙ্গলের গাছের তুলনায় এখনকার গাছপালা সব খুদে-খুদে মনে হবে। সে-কালের জঙ্গলের উপরের তলায় ছিল প্রচুর আলো আর আওয়াজ। সুন্দর সুন্দর রঙীন পাখী ফুলের ঝাড়ের মাঝে মাঝে গান গেয়ে গেয়ে সমস্ত জঙ্গল জমজমাট করে রাখতো।

এক জাতীয় বনমানুষ সেই সব গাছে ডালেডালে এমন করে বেড়াতো যে, মনে হত সমস্ত বনে-জঙ্গলে কে যেন তাদের জন্যে গাছের সঙ্গে গাছের সেতু বেঁধে দিয়েছে। মায়েরা নিজে সমস্ত ফলমূল চিবিয়ে চিবিয়ে বুকের মধ্যে জড়ানো

ছেলেদের তাই খাইয়ে দিত। বড় বড় ছেলেরা মায়েদের পা ধরে ঝুলে থাকতো। দলের কর্তা এগিয়ে যেত—আর সব দলবল আসতো পেছনে পেছনে। কিন্তু ওগুলো কি ধরনের বনমানুষ? আজকাল আর সে ধরনের বনমানুষ দেখা যায় না। চিড়িয়াখানাতেও তেমন বনমানুষ নেই। ঐ সব বনমানুষ থেকেই মানুষ, শিম্পাঞ্জী, গরিলা প্রভৃতির উৎপত্তি।

কাঠঠোক্‌রার মত আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উপরের তলায় আট্‌কা ছিল। জঙ্গলই তাদের কাছে ছিল বাড়ী-ঘর—সব কিছু। গাছের ফাঁকে ফাঁকে রাত্তিরে বসে তারা বাসা বানাতো। জঙ্গলই ছিল তাদের দুর্গের মত! তাদের শত্রু বাঘের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তারা সব সময়ে গাছের উপরে উপরে থাকতো। উঁচু ডালের ফল খেয়েই তারা দিন কাটাতো। গাছে গাছে চলতে হত বলে তাদের তেমনি ভাবে তৈরীও হতে হয়েছিল। দরকার ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-শক্তির, ক্ষিপ্র আঙুল চালনার, শক্ত আর ধারাল দাঁতের।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বনমানুষেরা তাই—এতক্ষণে দেখতে পাচ্ছ—বনেজঙ্গলে আটকা থাকতো। শুধু তাই নয়। জঙ্গলের উপরের তলা থেকে নামবার উপায় ছিল না তাদের।

হয়তো তোমরা জিজ্ঞেস করবে, তা হলে তারা জমিতে নামল কি করে? তাই শোন।

নায়ক ও তার আত্মীয়-কুটুম্ব

সে অনেক যুগের কথা।

তখনকার লেখকরা কোনও নায়ক সম্বন্ধে লিখতে গেলেই প্রথম কয়েক অধ্যায়ে পাঠকদের জানিয়ে দিতেন নায়কের পরিচয়, তার আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেরই কথা। তারপরে ক্রমে ক্রমে নায়ককে নিয়ে গল্পের বিষয় বর্ণনা করতেন।

তাদের উদাহরণ অনুসারে আমরা বর্ত্তমানে মানুষের কথা বলতে গিয়ে আগে তার আত্মীয়-কুটুম্বেরই পরিচয় দেব। কেমন করে সে প্রথম জগতে এল, হাঁটতে শিখল, ভাবতে শিখল, পেটের জন্য সংগ্রাম সুরু করল, সুখদুঃখের ইতিহাস গড়ল—সে সবই আসবে পরে।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, এ বিষয়টা বড় কঠিন। কেমন করে আমরা পুরাকালের সেই বনমানুষের বর্ণনা দেব? কোটি কোটি বছর পরে সাক্ষ্য দেবার জন্যে কে বেঁচে আছে? শুধু মাত্র মিউজিয়মে বসে বসে আমরা সেই পূর্ব্বপুরুষদের দেখা-সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু মিউজিয়মেও তাদের সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া কঠিন। হয়তো কোথাও তাদের ভাঙা হাত-পা রয়েছে, নয়তো দেখব দু-পাটি দাঁত মাত্র।

দাঁত-না-থাকা বুড়োবুড়ী তোমরা সবাই দেখেছ—কিন্তু শুধু দাঁত আছে আর সেই দাঁত দেখে তা-ই থেকে বুড়োবুড়ীর কল্পনা করতে পার?

মানুষ যখন দু-পায়ে ভর করে সত্যি সত্যি দাঁড়াতে শিখেছে তখনো তার আত্মীয় গরিলা, ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জীরা দু-পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারে নি—তারা এখনও জঙ্গলেই থাকে। গরিলা শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে মানুষের যে কোনও সম্পর্ক রয়েছে একথা অস্বীকার করতে পারলেই যেন মানুষ বাঁচে।

কিছুদিন আগে আমেরিকার একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের শেখাচ্ছিলেন যে, বনমানুষেরা হচ্ছে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ। তাতে আদালতে তাঁর বিচার হয়েছিল। শহরের একদল নামকরা হোমরা-চোমরা লোক রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করেন। তাঁরা কাগজে লিখে দেন—

"আমরা বাঁদর নই আর আমাদের নিয়ে বাঁদরামি করতেও দেব না।"

বেচারা স্কুল-মাষ্টার! এই সব গাধাকে পিটে ঘোড়া করবার ইচ্ছে তাঁর কোন কালেই ছিল না। সেই সময় বিচারকের ধমকানিতে হয়তো মাষ্টারের মনে হয়েছিল, "আচ্ছা, এটা নিয়ে যদি বিচার করতে পার তা হলে তো ছেলেদের নামতা পড়াই বলেও আমার বিচার করা বিচিত্র নয়!"

কিন্তু তিনি যাই ভাবুন না কেন, যথোচিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তাঁর বিচার শেষ হয়ে গেল।

বিচারে স্থির হল :—

১। মানুষের সঙ্গে বনমানুষের কোনও সম্পর্ক নেই।
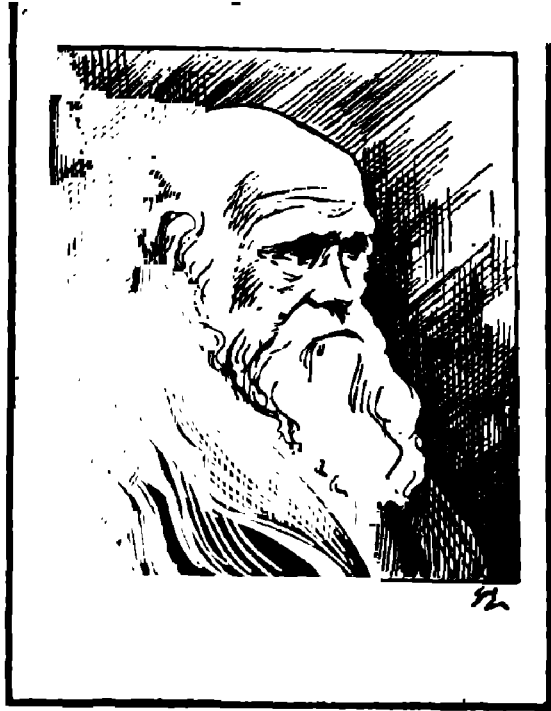
চার্লস্‌ ডারউইন

২। আসামীর ১০০৲ টাকা জরিমানা।

সুতরাং এতদিন ধরে বিখ্যাত বিজ্ঞানী চার্লস্‌ ডারউইন যে মতবাদ প্রচার করে এলেন, একদিনের কলমের আঁচড়ে এই "ঘটি-রাম" বিচারক তা মিথ্যে বলে রায় দিলেন! কিন্তু সত্যি ঘটনা ঢেকে রাখা কঠিন। বিচারকের আদেশে তা মুছে ফেলা যায় না। বনমানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে মোটা মোটা বই লেখা হয়েছে। তা বাদ দিলেও যে

কোনও লোক শিম্পাজী বা ওরাংওটাংকে একটু লক্ষ্য করলেই মানুষের আর এদের দুয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক বার করতে পারবে।

রোজা আর র‍্যাফেল

আগে যাকে কটুসি বলা হত (বর্তমান নাম প্যাভ্‌লভ) সেই গ্রামে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইভ্যান পেট্রোভিচ্ প্যাভ্‌লভের গবেষণাগারে দুটো শিম্পাঞ্জী আনা হয়—রোজা আর র‍্যাফেল। ওরা সাধারণতঃ মানুষের কাছে খুব ভাল ব্যবহার পায় না। তবে এবার এ-ক্ষেত্রে খুব যত্ন করা হয়। তাদের জন্যে একটা গোটা বাড়ী ছেড়ে দেওয়া হল—শোবার, খাবার, স্নানের, খেলার ঘর আর অফিস—সব নিয়ে জমকালো বাড়ী। শোবার ঘরে চমৎকার দুটি বিছানা। খাবার টেবিল সুন্দর চাদর দিয়ে ঢাকা, আর খাবার ঘর খাবারে বোঝাই। ঘর দেখে কেউ বলতে পারেনা যে, তা মানুষের নয়।

খাবার জন্যে তাদের টেবিলে কাঁটা-চামচ সব থরে-থরে সাজান থাকতো। তাদের বিছানায় চাদর, কম্বল, বালিশ সবই ছিল। এটা ঠিক যে, সেই অতিথি দু-জন সব সময় তোমার-আমার মত ভদ্রতা বজায় রেখে কাজ করতো না। হয়তো খাবার সময় কখনো কাঁটা চামচে ফেলে রেখে গোটা বাসন উঁচু করে চুমুক দিয়েই সব

খেয়ে ফেলল। রাত্তিরে তেমনি বালিশে মাথা না দিয়ে তারা মাথার উপরে বালিশ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তাই বলে তারা যে কিছুই মানুষের মত করতে পারতো না, তা নয়। রোজা তো যে-কোন লোকের মত স্বচ্ছন্দে চাবি দিয়ে আলমারী খুলতে পারতো। বাড়ীর সব চাবি সাধারণতঃ চৌকিদারের হাতে থাকতো। রোজা যে কখন পেছন থেকে তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে চাবি বের করে নিত তা সে টেরই পেত না! চাবি নিয়েই রোজা এক দৌড়ে খাবার ঘরে গিয়ে খাবার বের করে খেতে বসতো। আর র‍্যাফেল? তার ঘরে এক গোছা সুন্দর ফল টাঙানো। আর সেই ঘরে ছিল মাত্র কয়েক টুকরো ছোটবড় কাঠ। সব চেয়ে ছোট কাঠটা ছিল একটা টুলের মত। র‍্যাফেলের সমস্যা হল, কি করে সেই সব টুল জড়ো করে টাঙানো ফল পেড়ে খাওয়া যায়। প্রথম প্রথম র‍্যাফেল কিছুতেই পারছিল না। জঙ্গলে থাকলে সে এগাছ-ওগাছ করে নিশ্চয়ই ফলটা পাড়তো। এখানে তো বেয়ে উঠবার মত কিছু নেই। একমাত্র জিনিস হচ্ছে কাঠের টুলগুলো। আর মজা এই যে, কোন একটার উপর উঠে সে ফল ধরতে পারছিল না।

সেই টুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে র‍্যাফেল একটি নতুন জিনিস আবিষ্কার করল। একটা টুলের উপর আর একটা ওঠালে ফলের নাগাল পাওয়া সহজ হয়। সে অনেক

চেষ্টা করে একের উপর এক টুল জোড়া দিয়ে একটা পিরামিডের মত জিনিস দাঁড় করাল। কিন্তু র‍্যাফেল এখনো সবটা ঠিক করতে পারে নি। সবচেয়ে বড়কে নীচে দিয়ে ক্রমে ক্রমে ছোট-গুলোকে উপরে দিয়ে যেতে হয়—তবেই জিনিসটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। র‍্যাফেল অত কিছু জানতো না। সে ছোটর উপরে বড় দিয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে কয়েকবার আছাড় খেল। তারপরে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে ঘরের মেঝেয় বসে সে ভাবল।

তখন তাকে দেখে কেউ বলতো পারতো না যে, সে মানুষ নয়। তুমি আমি যেমন একটা কিছু করতে না পারলে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসি—ঠিক তেমনি করে র‍্যাফেল ভাবছিল। অবশেষে সে রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারল। আর যাবে কোথায়!

অমনি বড় থেকে ছোট টুলগুলো একের পর এক সাজিয়ে সে ফলগুলো পেরে খেতে বসল। তখন তাকে পায় কে!

অন্য কোনও জীব হলে কি মানুষের মত এই সব কাজ করতে পারতো? কুকুর কি টুল জড়ো করে পিরামিড গড়তে পারে?—কুকুর তো আর কম বুদ্ধিমান জীব নয়!

তা হলে শিম্পাঞ্জীকে কি মানুষ করা যায়?

আচ্ছা তাহলে শিম্পাঞ্জীকে কি হাঁটা-চলা শিখিয়ে মানুষের মত করা যায়? এক সার্কাসের জন্তুদের শিক্ষকের এটা ছিল আকাঙ্ক্ষা—মিমুস নামে একটা শিম্পাঞ্জীকে সে যত রকমে পারে শিক্ষা দিতে কসুর করে নি। মিমুসও খুব বাধ্য ছাত্রের মত কাঁটা-চামচ ব্যবহার করতে শিখল। গলায় ন্যাকড়া জড়িয়ে খাবার টেবিলে বসে মানুষেরই মত সে খেত। এমন কি, স্লেজ গাড়ী চালিয়ে সে পাহাড়ের নীচেও যেতে পারতো। কিন্তু তবু তাকে মানুষ করা যায় নি।

কেন যে তাকে মানুষের মত করা যায় নি, তাও বোঝা সহজ। তার শরীরের গড়ন মানুষ থেকে আলাদা। তার হাত, পা, মস্তিষ্ক, জিহ্বা—কোনটাই মানুষের মত নয়।

খুব ভাল করে শিম্পাঞ্জীর মুখের ভেতরটা দেখ। দেখবে যে, মুখের ভেতর জিবের নাড়াচাড়া করার মত বেশী জায়গা নেই। যেটুকু জায়গা রয়েছে তাও দাঁতে ভর্ত্তি! মুখের ভেতর

জিবের নড়বার মত যথেষ্ট জায়গা না থাকায় সে কোনদিনই মানুষের মত কথা বলতে পারবে না। কারণ, তোমরা যখন কথা বল—তখন ক্রমাগতই জিব নড়ে। জিব কখনো সামনে, কখনো পিছনে—কখনো বেঁকে যায়—কখনো সোজা হয়, তবেই মুখ থেকে কথা বেরোয়। ও-রকম না করতে পারলে কথা বার হয় না। শিম্পাঞ্জীর মুখে অতটা জায়গা ত নেই, তাই সে কথা বলতে পারে না।

শিম্পাঞ্জীর হাতও মানুষের মত নয় বলে সে এখনো ঠিক মানুষের মত কাজ করতে পারে না। তার বুড়ো আঙুল কড়ে আঙুলের চেয়ে ছোট। আমাদের হাতের মত তাদের বুড়ো আঙুল আবার এতটা দূরে সরানো নেই। আমাদের বুড়ো আঙুলই সব চেয়ে বেশী দরকারী, ইচ্ছে করলে যে কোনও আঙুলের সঙ্গে বুড়ো আঙুল কাজ করতে পারে। কিন্তু শিম্পাঞ্জীর পক্ষে তা সম্ভব নয়।

শিম্পাঞ্জীর হাত অনেকটা আমাদের পায়ের মত। গাছের কোন ফল পাড়তে হলে অনেক সময় শিম্পাঞ্জী হাত দিয়ে ডাল ধরে, আর পা দিয়ে ফল পাড়ে! মাটিতে চলবার সময়ও সে হাতে ভর দেয়। হাতের কাজ চালায় প্রায় পা দিয়েই, আর পা'র কাজ করে হাত দিয়ে। মানুষ কিন্তু এমনি উল্‌টো ভাবে চললে বিশেষ কিছুই করতে পারতো না।

হাত পা মুখ ছাড়াও আর একটা জিনিস আছে যার জন্যে

শিম্পাঞ্জী মানুষ হতে পারে না। শিম্পাঞ্জীর মস্তিষ্ক মানুষের মত এত বড় নয়। তাতে এত ভাঁজও নেই। হাজার হাজার বছর ধরে বনমানুষকে মানুষ হতে হয়েছে। মস্তিষ্কের পার্থক্যের দরুণ শিম্পাঞ্জী মানুষের মত ভাবতে পারবে না। তবে মানুষের তুলনায় যাই হক না কেন নিজের জঙ্গলে তাকে কেউ হারাতে পারবে না। দৌড়ে দৌড়ে সে এ-গাছ থেকে ও-গাছে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে।

এদের দেশ আফ্রিকায়। শিম্পাঞ্জী জঙ্গলের সব চেয়ে উপরের তলায় থাকে। সেখানে গাছের ডালের মধ্যে তারা বাসা বাঁধে। গাছে গাছে ঘুরে তারা ফল খেয়ে বেড়ায়। মাটিতে নামতে তাদের মোটেই ইচ্ছে করে না। জঙ্গল ছাড়া কোনও শিম্পাঞ্জী থাকতে পারে না।

আফ্রিকায় ক্যামেরুণস্ বলে একটা জায়গা আছে। শিম্পাঞ্জীরা নিজেদের জঙ্গলে কেমন করে বসবাস করে তা চাক্ষুষ দেখবার জন্যে একবার একজন বিজ্ঞানী সেখানে যান। প্রায় এক ডজন শিম্পাঞ্জী ধরে এনে তিনি তাঁর বাসার পাশে একটা জঙ্গলে তাদের বসবাস করান। যাতে তারা সেই জঙ্গল থেকে পালিয়ে না যায় সে জন্য তিনি জঙ্গলের চার দিক পরিষ্কার করে ফেললেন। ঐ নির্দ্দিষ্ট জঙ্গলের আশেপাশে আর গাছ রইল না। শিম্পাঞ্জীগুলোও আর সেই জঙ্গলের বাইরে যেত না। এ থেকে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন, শিম্পাঞ্জীরা নিজের ইচ্ছায় মাটিতে নামে না। মেরু দেশীয় ভালুককে যেমন

মরুভূমিতে এনে রাখা যায় না, তেমনি শিম্পাঞ্জীকেও গাছ না থাকা জায়গায় রাখা কঠিন।

এবার তাহলে সমস্যা দাঁড়াচ্ছে, শিম্পাঞ্জী যদি নিজের ইচ্ছেয় জঙ্গল থেকে মাটিতে না আসতে চায় তো তার কুটুম্ব, মানে, মানুষের পূর্ব্বপুরুষ কেমন করে প্রথমে মাটিতে নামল ?

নায়কের হাঁটা শেখা

মানুষের পূর্ব্বপুরুষরা কেউ হঠাৎ এক দিনেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মাটিতে নামে নি। গাছ থেকে মাটিতে নামতে তাদের হাজার হাজার লাখ লাখ বছর কেটেছে।

সবার আগে তাকে শিখতে হয় গাছের ডগা থেকে মাটিতে নেমে আসা। এখন দেখবে, হাঁটতে শেখা কত কঠিন! ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কতদিন ধরে হামাগুড়ি দেয়! তারপরে আরও কতদিন লাগে দু-পায়ে চলা শিখতে! শিশুর পক্ষে যে কাজ শিখতে এখন মাত্র কয়েক মাস লাগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে তাই লেগেছে হাজার হাজার বছর!

গাছে গাছে থাকবার সময় থেকেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা হাত দিয়ে দু-একটা নতুন জিনিস তৈরী করা শেখে। ফল পাড়া, বাসা বাঁধা ছাড়াও তারা ডাল ভাঙার কাজ করতে শেখে। যে জিনিস তারা হাতে পায় না সেটা, ডাল ভেঙে তা-ই দিয়ে পাড়তে জানতো। অনেক সময় সেই জিনিসটাও হয়তো মাটিতে

যেত পড়ে। তখন তাকে বাধ্য হয়ে নীচে নামতে হত। মাটিতে নেমে পাথর দিয়ে তারা শক্ত বাদামও ভাঙতে শিখল।

তখন ক্রমেই তাদের খাবার জিনিসের তালিকা বেড়ে গেল। তারা অন্যান্য পশুপাখীদের খাবার খেতে সুরু করল। ফলে আগের চেয়ে বেশী করে তাদের নীচে নামতে হল। লাঠি দিয়ে গর্ত্ত খুঁড়ে তারা পোকামাকড় খেতে লাগল। পাথর দিয়ে ঠুক্‌রে তারা কঠিন জিনিসের ভেতর থেকে পোকার বাচ্চা বের করে খেতে শিখল। এই ভাবে হাতের কাজ বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটার কাজ থেকে হাত অনেকটা খালি করবার দরকার হয়ে পড়ল। এতদিন সে দু-হাতে আর দু-পায়ে ভর দিয়ে বেড়াতো। কিন্তু ক্রমেই হাতে ভর দেওয়া কমে যাচ্ছিল।

কালক্রমে পৃথিবীতেই একটা নতুন জীব দেখা গেল—যে পেছনের দুই পায়ে হাঁটে আর সামনের দুটি পা দিয়ে নানা কাজ করে! এর চেহারা তখন ছিল অন্য সব জন্তুরই মতন। কিন্তু তোমরা যদি কেউ তখন দেখতে, তারা কেমন করে পাথর বা ডালপালা নিয়ে কাজ করে তা হলে তখনি বুঝতে পারতে যে, এরাই হচ্ছে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। কারণ মানুষ ছাড়া আর কেউ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেই পারে না। ইঁদুর দাঁত দিয়ে মাটি খোঁড়ে, কাঠঠোক্‌রাও ঠোঁট দিয়েই গাছে গর্ত্ত করে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অমন ঠোঁট বা দাঁত কিছুই ছিল না। তাদের সম্বল ছিল দুটো হাত।

নায়ক এবার মাটিতে নামল

এসব কাণ্ড যখন ঘটছিল তখন পৃথিবীর আবহাওয়াও পরিবর্ত্তিত হচ্ছিল। খুব উত্তরে বরফের পাহাড় ধসে দক্ষিণে নেমে আসছিল। পাহাড়ের উপর শীতের প্রকোপ আরও বাড়ছিল। পূর্ব্বপুরুষদের বাসস্থানের জঙ্গলে আরও বেশী ঠাণ্ডা পড়ছিল। আবহাওয়া অবশ্য তখনো একেবারে ঠাণ্ডা হয় নি, একটু উষ্ণ ছিল।

দেখতে দেখতে জঙ্গলের গাছগাছড়ার পরিবর্ত্তন হতে লাগল। ডুমুরগাছ, আঙুরের থোকা আস্তে আস্তে দক্ষিণে সরে আসতে থাকল। আর কতকগুলো গাছ শীত সহ্য করতে না পেরে সব পাতা ফেলে দিয়ে মড়ার মত ঠুনো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল! গ্রীষ্মমণ্ডলের জংলা গাছগাছড়া ক্রমেই দক্ষিণে সরে আসতে থাকে। সেই সঙ্গে জঙ্গলের বাসিন্দারাও সরতে লাগে। হাতীর পূর্ব্বপুরুষ ম্যাস্টোডন (Mastodon) সে পরিবর্ত্তনে খাপ খাওয়াতে না পেরে লোপ পায়। আগের তলোয়ার-মুখো বাঘও দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। আগে যেখানে জঙ্গলের নীচে ঘন গাছপালা থাকতো এখন সেখানে পরিষ্কার জায়গা দেখা গেল। দলে দলে গণ্ডার আর হরিণ সে-সব মাঠে চরে বেড়াতো। বনমানুষের মধ্যে অনেকে পালিয়ে বাঁচল, আবার কেউ কেউ মরে গেল। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো খুব কঠিন কাজ।

কারণ যত দিন যাচ্ছিল ততই বনমানুষের উপযুক্ত খাবারও কমে আসছিল। বন ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় এক গাছ থেকে আর এক গাছে যাতায়াত কঠিন হয়ে পড়ল। সবাইকে তখন বাধ্য হয়ে বেশী করে মাটিতে নামতে হত। মাটিতে নামাই সব নয়। আততায়ীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করাও তখন দরকার হয়ে পড়ল।

এর ফলে জঙ্গলের সমস্ত আইন-কানুনই উল্টেপাল্টে গেল। কাঠবিড়ালী গাছে গাছে ছিল। মাটিতে নামলে তার অন্য রকম দাঁত দরকার। আগের মত খাবা দিয়েও আর চলবে না। এখন তার লম্বা লেজের উপকারিতাও কমে গেল। লেজটা আগে লাফাবার সময় প্যারাস্যুটের কাজ করতো। আর এখন শত্রুদের কাছে ওটাই একটা নিশানার মত হয়ে পড়ল। কাজেই জঙ্গল ছেড়ে মাটিতে নামতে এসে আগের গোটা চেহারাই বদলাতে হল। এক কথায় সে আর আগের কাঠবিড়ালী থাকল না।

এমনি করে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদেরও হাবভাব চালচলন বদলাতে হয়েছিল—তা না হলে তাদের আরও দক্ষিণে বন-মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে চলে যেতে হত। ইতিমধ্যেই বনমানুষ থেকে তারা পৃথক হয়ে পড়েছিল। কারণ খাবার জন্যে তাদের দক্ষিণে না গেলেও চলতো। গাছপালা কমে যাওয়াতেও তারা ভয় পেল না। এতদিনে তারা হয়তো হাঁটতে শিখেছে। হঠাৎ কোনও শত্রুর হাতে পড়লে তারা

একজোট হয়ে ভাল ভাবে তাকে মারতেও পারতো। সেই শীতের কঠিন আবহাওয়ায় পূর্ব্বপুরুষরা না মরে গিয়ে আরো তাড়াতাড়ি মানুষ হবার পথে এগোতে থাকে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মত উন্নত হতে না পারায় অন্য বনমানুষদের ক্রমেই দক্ষিণে চলে যেতে হল! তারা শিখল কি ভাবে আরও ভাল করে গাছে চড়ে থাকতে হয়। হাত ছাড়া এবার পা দিয়েও গাছ আঁকড়ে ধরতে তারা শিখল। এদের সামনে আর এক বিপদ দেখা দিল। জঙ্গলের নানা শত্রুর মধ্যে বাঁচতে হলে গায়ের জোর দরকার। বড়বড় জন্তুরাই বাঁচতে পারতো। আবার, যত বড় শরীর হবে গাছে থাকাও ততই কঠিন হবে। কাজেই তাদের গাছ থেকে নেমে আসতে হল! সেই গাছের গরিলাই এখন মাটিতে থাকে।

এই ভাবে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ আর বনমানুষের জীবনযাত্রা পৃথক হয়ে পড়ে!

হারানো সূত্র

সে-কালের মানুষ দেখতে কেমন ছিল? সেই পূর্ব্ব-পুরুষদের নমুনা আজকাল পাওয়া যায় না। লক্ষ লক্ষ বছর আগে তারা মানুষে পরিণত হয়েছিল। তবে খুঁজলে তাদের হাড়গোড় এখনো পাওয়া যায়। তাদের সেই সব হাড় দেখেই, বানর থেকে মানুষের উৎপত্তির আমরা যথেষ্ট প্রমাণ

পাব। এই "বানর-মানুষই" (Ape-man) হচ্ছে বানর থেকে মানুষে রূপান্তরের মাঝখানের হারানো সূত্র। এ পর্য্যন্ত এর কোন চিহ্নই কোথাও পাওয়া যায় নি।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মাটি খুঁড়ে নানা নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু তার আগে তাদের স্থির করে নিতে হবে, কোথায় মাটি খুঁড়বেন। পৃথিবী তো একটুখানি জায়গা নয়!

গত শতাব্দীর শেষে বিখ্যাত বিজ্ঞানী হেকেল এর এক-পথ বাত্‌লে দিলেন। তা হচ্ছে এই যে, "বানর-মানুষ" বা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় পিথেক্যানথ্রপাস (Pithecan-thropus) তার হাড় দক্ষিণ এশিয়াতে পাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাপেও তিনি দেখিয়ে দেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরে পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সুন্দা দ্বীপে পিথেক্যানথ্রপাসের হাড় খুব সম্ভব পাওয়া যাবে। তখন অনেকেই তাঁর এই মতকে হেসে উড়িয়ে দেন।

ডাক্তার ইউজেন দুবোয়া (Eugene Dubois) আমস্টারডাম বিশ্ববিত্যালয়ের একজন অধ্যাপক। হেকেলের কথায় নির্ভর করে তিনি বানর-মানুষের হাড়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর বন্ধুবান্ধব অন্যান্য অধ্যাপক সবাই অতদূরে গিয়ে হাড় খোঁজবার কথায় তো হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তাঁরা সবাই বড়জোর আমস্টারডামের সদর রাস্তা ধরে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত। কিন্তু একেবারে অতদূরে পাগল না হলে কেউ যেতে পারে!

কিন্তু তাদের কথায় না ঘাবড়িয়ে অধ্যাপক ডুবোয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে দিয়ে ওলন্দাজ সৈন্যদের সঙ্গে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায় আমস্টারডাম থেকে সাত সমুদ্দুর পারে সুন্দা দ্বীপে চলে যান। সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছেই ডুবোয়া কাজ আরম্ভ করে দেন। স্থানীয় কয়েকজন লোকের একটা দল গড়ে নিয়ে তিনি মাটি খুঁড়তে শুরু করেন। তাঁরা বহু জায়গা খুঁড়লেন—মাটির পাহাড় উঠে গেল তবু কোন কিছু পাওয়া গেল না। এদিকে মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে।

এ তো আর সোজা কাজ নয়। তোমাদের কোনও জিনিস যদি হারিয়ে যায় তো তোমরা অক্লান্ত ভাবে তা খুঁজতে পার—কারণ এটা ঠিক জানো যে, কোথাও না কোথাও জিনিসটা নিশ্চয়ই আছে। আর ডুবোয়া তো জানেন না যে, সত্যই কোথাও হাড় আছে কি-না!—তবু তিনি অধৈর্য্য না হয়ে মাটি খুঁড়েই চলেছেন। দেখতে দেখতে বছর পেরিয়ে গেল—এক, দুই, তিন! তবু হারানো সূত্র পাওয়া গেল না।

অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই আর খুঁজতো না, কিন্তু ডুবোয়া ভিন্ন ধাঁচের লোক। তিনি আবিষ্কারের নেশায় পাগল। কাজেই সুমাত্রায় না পেয়ে তিনি যাভায় খোঁজ করতে লাগলেন।

এবার যেন ভাগ্যদেবী একটু সুপ্রসন্না হলেন। কেনডেঙ্গ (Kendeng) পাহাড়ের নীচে বেঙ্গোয়ান (Bengwan) নদীর গর্ভে তিনি দুটো দাঁত আর উরুর হাড় ও পিথেক্যানথ্রপাসের মাথার খুলির উপরের অংশটা পেলেন। সেটা হচ্ছে ক্রমশঃ

নেমে আসা কপাল, আর তাতে দেখা যাচ্ছে কুঞ্চিত ভুরু। তার নীচেই চোখের গর্ত। দেখতে মানুষের চেয়ে বানরের খুলির সঙ্গেই সেটার বেশী মিল। কিন্তু খুলির ভেতরটায় নজর করে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, বনমানুষের চেয়ে পিথেক্যানথ্রপাস অনেক বেশী চালাক ছিল। বনমানুষের চেয়ে তার মস্তিষ্কের গহ্বরও অনেক বড়।

পিথেক্যানথ্রপাস

মাথার খুলির একটা অংশ, দুটো দাঁত আর উরুর হাড়—এগুলো অবশ্য কিছু বেশী নয়। কিন্তু তা থেকেই ডুবোয়া অনেক সত্য আবিষ্কার করেন। সেই উরুর হাড় ভাল করে পরীক্ষা করে তিনি স্থির নিশ্চিত হলেন যে, পিথেক্যানথ্রপাস

হাঁটতে শিখেছিল। তখনো কিন্তু সে চার পায়ে চলা বাদ দেয় নি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তখন কেমন দেখতে ছিল—কেমন করে তারা কুঁজো হয়ে হাঁটতো, হাঁটুর কাছে পা কেমন করে হাঁটবার সময় বেঁকে থাকতো—আর হাত দুটো ঝুলতে থাকতো—এ সব ছবির মতই তাঁর চোখে ভাসতে লাগল। চলবার সময় তাদের চোখের ভঙ্গী সব সময়ে নীচের দিকে থাকতো খাবারের সন্ধানে। এ নিশ্চয়ই বনমানুষ নয়—আবার মানুষও একে বলা যায় না। ডুবোয়া এর নতুন নামকরণ করলেন—পিথেক্যানথ্রপাস ইরেক্টাস (Pithecanthropus Erectus), অর্থাৎ যে পিথেক্যানথ্রপাস সোজা হয়ে চলে।

কিন্তু ডুবোয়ার কাজ তখনো শেষ হয় নি—এটা শুধু আরম্ভ। মাটি খোঁড়া অনেক সহজ, কিন্তু সমসাময়িক লোকজনের কুসংস্কার দূর করা আরও অনেক বেশী কঠিন। তাই বহু লোক ডুবোয়াকে চার দিক থেকে আক্রমণ শুরু করল। তারা উঠে পড়ে প্রমাণ করতে চাইল যে, মাথার খুলিটা গিবন নামে এক রকম জন্তুর আর উরুর হাড় হচ্ছে কোনও একালের মানুষেরই। এক কথায় তারা চক্রান্ত করে ডুবোয়ার আবিষ্কারকে ধামা-চাপা দিতে চাইল।

কিন্তু নির্ভীক ডুবোয়া বিজয়ীর মত নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করে দেন যে, গিবনের কখনো বের-করা কপাল থাকে না; কিন্তু তাদের সমালোচনা

বন্ধ করবার জন্যে একটা পুরো কঙ্কাল না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছু করাও যাচ্ছিল না।

তাই তিনি একটা পুরো কঙ্কাল যোগাড়ের চেষ্টা শুরু করলেন। কাজেই বেঙ্গোয়ান নদীর পার ধ'রে খোঁজা চলতে থাকে। পাঁচ বছরের মধ্যে ডুবোয়া প্রায় তিন-চারশো বাক্স হাড় ইউরোপের পণ্ডিতদের কাছে পাঠালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, ঐ হাজার হাজার হাড়ের মধ্যে মাত্র তিনটি উরুর হাড় ছিল পিথেক্যানথ্রপাসের!

এ ভাবে বছরের পর বছর কেটে গেল। এমন সময় হঠাৎ আর একজন বিজ্ঞানী পিথেক্যানথ্রপাস আর মানুষের মধ্যেকার হারানো সূত্র আবিষ্কার করেন।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে এই বিজ্ঞানী চীনের রাজধানী পিপিং-এর এক ওষুধের দোকানে ওষুধ কিনতে ঢোকেন। সেখানে হরেকরকম জিনিসের মধ্যে তিনি একটা অদ্ভুত দাঁত খুঁজে পেলেন। সেটি কোন মানুষেরও না, আবার কি রকম জন্তুর তাও ঠিক করতে তিনি পারলেন না। কাজেই তিনি সেটাকে "চীনা দাঁত" নাম দিয়ে ইওরোপে পাঠিয়ে দেন। প্রায় কুড়ি বছর পরে চীনের চো-কো-তিয়েন (Chow-Kow-Tien) নামে এক গুহায় ঐ রকম আর দুটো দাঁত পাওয়া যায়। আরও কিছুকাল পরে ঐ দাঁতের মালিকের কঙ্কালটাও সেখানে পাওয়া যায়। তখন বিজ্ঞানীরা তার নাম রাখেন— সিনানথ্রপাস (Sinanthropus)।

সত্যি বলতে গেলে তারও সবটা কঙ্কাল পাওয়া যায় নি। মাত্র ৫০টি দাঁত, ৩টি মাথার খুলি, ১১টি চোয়ালের হাড়, একটি উরুর হাড়, একটি মেরুদণ্ডের হাড়, একখানা কণ্ঠাস্থি, একটি কব্জির ও একটি পায়ের হাড়।

এ থেকে কিন্তু চট্ করে মনে করো না যে, গুহাবাসীর তিনটি মাথা আর একটি মাত্র পা ছিল। এর মানে এই যে, ঐ গুহায় একদল সিনানথ্রপাস থাকতো! হাজার হাজার বছরের মধ্যে আর-সব হাড় হয়তো হারিয়ে গেছে—বনজঙ্গলের পশুরাও সে সব নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে সব হাড় পাওয়া গেছে তা থেকে খুব সহজেই বোঝা যায়, গুহার লোকেরা দেখতে কেমন ছিল। তারা কিন্তু মোটেই সুন্দর ছিল না দেখতে।

তাদের দেখলে হয়তো তোমরা দৌড়ে পালাতে। তখনো দেখতে তারা অনেকটা বানরের মত, মাথা সামনে বাড়িয়ে হাত দুটো ঝুলিয়ে তারা চলে। কিন্তু একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে বানরের সঙ্গে তাদের পার্থক্য নজরে পড়বে। কোনও বানরের মাথাই এদের মত নয়। এদের মাথা অনেকটা মানুষের মত। থপ্ থপ্ করে তারা চলে। হঠাৎ হয়তো বালুর মধ্যেই বসে পড়ল। পাশের পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ঘষতে ঘষতে এগোল। একটু দূরে একটা গুহার সামনে এসে তাদের কেউ দেখতে পেল যে, তারই মত আরও অনেকে জড়ো হয়েছে সেখানে। এদের মধ্যে দাড়িওয়ালা একজন ভারিক্কী লোক

পাথরের অস্ত্র দিয়ে শিকার-করা হরিণের মাংস কাটছে। মেয়েরা পাশে থেকে হাত দিয়ে সেই মাংস টুক্‌রো টুক্‌রো করছে। ছোট ছোট ছেলেরা সবাই চারদিক থেকে মাংস চাইছে। সেই গুহার ভেতরের প্রজ্জ্বলিত আগুনে সেই সম্পূর্ণ দৃশ্য আলোকিত।

এতক্ষণে তোমাদের সন্দেহ দূর হল—না? কোনও বানর কি এমন করে খেতে পারতো? কখনই নয়।

তোমরা হয়তো আবার জিজ্ঞেস করবে, সিনানথ্রপাসরা যে পাথরের অস্ত্র আর আগুন ব্যবহার করতে পারতো তার প্রমাণ কি? চো-কো-তিয়েনের গুহাই সে বিষয়ে প্রমাণ। সেই গুহা খুঁড়তে গিয়ে মস্ত বড় ছাইয়ের স্তর আর বহু পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। হয়তো তারা নিজেরা আগুনের ব্যবহার না জানলেও জঙ্গল থেকে আগুন যোগাড় করে গুহায় এনে রাখতো। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত আগুনেরই ছাই জমে ঐ স্তর তৈরী হয়েছিল।

হস্তরেখা

পাথরের অস্ত্র আর গাছের ডালের গদা হাতে নেবার সঙ্গে-সঙ্গেই মানুষের জোর বাড়ল। এখন সে শুধু ফলমূলের ভরসায় বসে রইল না। খাবার অন্বেষণে সে দূরে দূরেও যেতে পারতো। এতদিনের জঙ্গলের আইনকানুন ভেঙ্গে সে বাইরের জগতেও আনাগোনা শুরু করেছে।

মানুষের তাই প্রথম কাজ হল, জঙ্গলের আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। গাছের জীব হয়েও সে মাটিতে নামল। চার-পায়ের জায়গায় সে দুপায়ে হাঁটল। সে এমন সব খাবার খায় যা কোনকালেই তার খাবার কথা নয়। শুধু তাই নয়—তার খাবার যোগাড়ের কায়দাও হল অভিনব। তার সব চাইতে বড় কাজ হল, আগের "খাদ্যশৃঙ্খল" ভেঙ্গে ফেলা। এর আগে সে ছিল ধারালো খাঁড়ার মত দাঁত-ওয়ালা (Sabre-toothed tiger) বাঘের খাদ্য। এখন সে আর বাঘের মুখের খাবার হতে রাজী নয়।

মানুষ শুধু তার হাতের উপর নির্ভর করেই এত অসমসাহসিক কাজ করতে সাহস পেল। যে পাথর আর গাছের ডাল দিয়ে সে খাবার যোগাড় করতো তাই তাকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করল। আর কখনো সে জঙ্গলে একা একা ঘুরে বেড়ায় না। এখন তারা সব সময় দলে দলে ঘুরে বেড়ায়। কাজেই দলের হাতে পাথর আর গদা থাকলে যে-কোনও জীবকে সহজেই পরাস্ত করতে পারা যেত। তা ছাড়া আগুনের কথা ভুললে চলবে না। আগুনের আলোয় অন্য সব জন্তুরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত।

একবার কোনও রকমে খাদ্যশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েই সেই মানুষ জঙ্গল থেকে নদীর উপত্যকা ধরে চলতে থাকে। আমরা কেমন করে জানলাম যে, 'মানুষ' নদীর ধার ধরে চলতো ?—তার যাতায়াতের চিহ্ন থেকে। কিন্তু এতদিন ধরে সে চিহ্ন কেমন করে ঠিক থাকল ? সে কথাই শোন।

প্রায় একশো বছর আগে ফ্রান্স দেশের সোম (Somme) নদীর উপত্যকায় কয়েক জন শ্রমিক মাটি খুঁড়ছিল। তারা সেই উপত্যকায় অনাদি কাল থেকে জমা-করা বালু আর পাথর খুঁড়তে থাকে।

প্রথম অবস্থায়—বহু বহু যুগে আগে—সোম নদী ছিল খুব চঞ্চল আর তাতে স্রোত ছিল অসম্ভব। কাজেই যা-কিছু পেয়েছে নদী তাই স্রোতের মুখে টেনে নিয়ে চলেছে। এমনি ভাবে পাথরের সঙ্গে পাথরে লেগেছে ঘষা, কোনটা গেছে ভেঙ্গে, কোনটা হয়েছে পালিশ, কোনটা হয়েছে ধারাল, কোনটা হয়েছে নুড়ি, আবার কোনটা হয়তো পাথর। পরে নদীর গতিবেগ কমে এলে ঐ সব পাথরের উপর পলিমাটি জমে উঠল। ঐ সব জমা জিনিসই শ্রমিকেরা খুঁড়ছিল। কতকগুলো পাথর ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের। সেগুলো ক্রমেই আগার দিকে ছুঁচলো হয়ে এসেছে। কখনই নদীর স্রোতে কোন জিনিস আপনা থেকে তেমন দুদিকে ধারাল হতে পারতো না। কেমন করে তাহলে ওগুলো অমন ছুঁচলো হল ?

বুশের দ্য পেরথে (Boucher de Perthes) নামে একজন লোকের নজরে এগুলো পড়ে! তাঁর বাড়ীতে নানা পুরানো জিনিস জড়ো করা থাকতো। কিন্তু তাঁর সংগ্রহের মধ্যে পুরাকালের মানুষের কঙ্কাল ছিল না। এমন সময় তিনি পেলেন ঐ পাথরের টুক্‌রোগুলো। তিনিও এই নিয়ে

বিস্তর মাথা ঘামালেন। মাথা ঘামিয়ে শেষে তিনি স্থির করলেন যে, এগুলো মানুষেরই কাজ। এগুলো যদিও মানুষের অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ নয়, তবু এগুলো যে তার স্মারকচিহ্ন—তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না !

বুশের দ্য পেরথে অনেক গবেষণা করে এক বই লিখলেন : "সৃষ্টিরহস্য—জীবন্ত প্রাণীর উদ্ভব ও পরিবৃদ্ধি।"

এর পরেই শুরু হল আবার তাঁর উপর আক্রমণ। দুবোয়াকে যেমন বহু সমালোচনা শুনতে হয়েছিল এঁকেও তেমনি একদল সমালোচকের সম্মুখীন হতে হল। প্রায় পনেরো বছর এই লড়াই চলে। বুশের নিজের মনে কিন্তু কাজ করে যেতেন। পর পর তিনি আরও দুটো বই লিখে ফেললেন। অবশেষে তাঁরই হল জয়।

ভূতত্ত্ববিদ্ লিয়েল (Lyell) ও প্রেস্টউইচ্ (Prestwich) তাঁকে সাহায্য করলেন। তাঁরা নিজেরা সোম উপত্যকায় গিয়ে সব পরীক্ষা করে দেখলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব আলোচনা করে তাঁরা স্থির করলেন যে, সেকালে যারা ফ্রান্সের এ অঞ্চলে বাস করতো ঐ অস্ত্রগুলো সেই সব মানুষেরই।

লিয়েল বই লিখলেন : 'মানুষের পৌরাণিকত্বের ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ'। তাতেই পেরথের সমালোচকদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন আবার তাঁরা অন্য কথা বলতে শুরু করেন : এ ত সোজা কথা, এ সকলেই জানতো।

লিয়েল কৌতুক করে তার উত্তর দেন—"যখনই কোনও বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার হয়, তখন লোকে তার মুণ্ডপাত করে তাকে অশাস্ত্রীয় বলে। কিন্তু যখন আবার সে মত প্রতিষ্ঠিত হয়—তখন তারাই বলতে থাকে, এ তো সকলেই জানে—এতে আবার কি নতুনত্ব আছে?"

পেরথে'র আবিষ্কারের পরে আরও নানা অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সে সব প্রায়ই নদীর ধারে পাওয়া গেছে। এই সব অস্ত্রই হচ্ছে "হস্তরেখা" যা অনুসরণ করে নদীর উপত্যকায় আমরা মানুষের খোঁজ পাই।

এ-সব মানুষ ছাড়া অন্য কারো হাতের কাজ হতে পারে না। অন্য কোনও জন্তু এ-সব অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে পারেই না।

খন্তা-হাতা মানুষ

অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে না পারলে মানুষের দশাটা কি হত? তখন নতুন কোনও অস্ত্র ব্যবহার সে শিখতে পারতো না। মাটি খুঁড়তে হলে তাকে খন্তা-হাতা হয়েই জন্মাতে হত! যদি তেমন মানুষ কেউ হয়ও তাহলে সে হয়তো খুব ভাল ভাবে মাটি খুঁড়তে পারবে, কিন্তু সে আর কাউকে সে-কাজ শেখাতে পারে না। ঐ খন্তা-হাত নিয়েই তাকে চলাফেরা করতে হবে! ঐ হাত দিয়ে সে আর কোন কাজই করতে পারবে না।

শুধু তাই নয়। এ রকম হাত পৃথিবীতে সেই সব জীবেরই থাকে, যাদের মাটির নীচে থাকতে হয়। যে জীব মাটির উপরে থাকবে—তার পক্ষে এ রকম হাত অনাবশ্যক বিলাসিতা।

কাজেই দেখতে পাচ্ছ খন্তা-হাতা মানুষ হলে আমাদের কি বিপদ হত। আমরা তার বদলে কত সুখে আছি। ইচ্ছা করলেই খন্তা গড়িয়ে নিচ্ছি—নয়তো দরকার মত ছুরি, কাঁচি—যা দরকার তাই বানিয়ে কাজ চালাচ্ছি। পূর্ব্ব-পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যে কুড়িটি আঙুল আর বত্রিশটি দাঁত আমরা পেয়েছি, তাই নিয়ে হাজার রকমের কাজ করছি—তার হিসেব কে রাখে? এই সব সুযোগ ঘটায় জঙ্গলের অন্য কোনও জীব মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে পারে নি—পারবে না।

মানুষ আর নদী যন্ত্রপাতি বানায়

মনুষ্যত্বের প্রথম যুগে কিন্তু মানুষ তার অস্ত্রশস্ত্র নিজে কিছুই বানায় নি। নদীর পার থেকে সে ধারাল পাথর কুড়িয়ে নিত। যেখানে নদীতে পাঁক ছিল বেশী—সেখানেই ঐ সব অস্ত্রও পাওয়া যেত বেশী করে। নদীর স্রোতে টেনে আনা সব পাথরই তাই বলে মানুষের কাজে আসতো না। সে গুলোর মধ্য থেকে বেছে বেছে নিয়ে মানুষকে কাজ চালাতে হত।

ক্রমে মানুষ দেখে নদীর দয়ার উপর নির্ভর করে থাকায় কোন লাভ নেই। তাই তারা নিজেরাই পাথর ঘষে অস্ত্র বানাতে আরম্ভ করে। মানুষের স্বভাবই এই। ক্রমাগত একটা থেকে আর একটা জিনিস আবিষ্কার করাই তার নেশা। পাথরের অস্ত্র থেকে আরম্ভ করে হাজার হাজার বছর পরে মানুষ অবশেষে ব্যবহার শুরু করে অস্ত্রের। এই ভাবে পদে পদে প্রকৃতির নিজের জিনিসকে বুদ্ধি খাটিয়ে তার নিজের প্রয়োজন মত তৈরী করে নিয়ে মানুষ প্রকৃতির নাগপাশের বাঁধন থেকে মুক্ত হচ্ছিল।

প্রথমটায় মানুষ অস্ত্রের উপাদান তৈরী করতে জানতো না। যখন যেমন উপাদান পাওয়া যেত শুধু তাই নিয়ে সে অস্ত্র গড়াতো।—কোনও একটা পাথর নিয়ে আর একটি পাথরের সঙ্গে ঠুকে তাকে ভেঙ্গে তাই দিয়ে সে অস্ত্র বানাতো। কুড়ুলের কাজ করবার মত পাথর প্রথমে পাওয়া যায়। কিন্তু পরে সেই সব পাথর দিয়ে কাটার, ছাঁটার, গর্ত্ত করার কাজ চলতো।

আদিম কালের যে সব অস্ত্রের নমুনা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে নদীর স্রোতে আপনি গড়া পাথরের এত সাদৃশ্য থাকে যে, বলা কঠিন সেগুলো মানুষের, না নদীর তৈরী। কিন্তু এ ছাড়া আরও এমন অনেক যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে যা দেখলে কোনই সন্দেহ থাকে না যে, সেগুলো মানুষের হাতেই গড়া। মানুষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কেউ সে সব তৈরী করতে পারে না।

প্রকৃতিতে সবই হয়, কিন্তু সেই সব হওয়ার পেছনে কোন ভাবনা-চিন্তা নেই—নেই কোন উদ্দেশ্য। কেবল

মানুষই উদ্দেশ্য নিয়ে সজ্ঞানে সব কাজ করে থাকে। এই ভাবে জগতে প্রথম 'পরিকল্পনার' উদ্ভব হয়। এতে মানুষের স্বাধীনতা গেল আরও বেড়ে। এর পর সে নিজেই নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র বানাতে শেখে।

জীবন-বৃত্তান্তের শুরু

যে-কোন জীবন-চরিত পড়তে গেলে তোমরা দেখবে, প্রথমেই নায়কের জন্মস্থান, জন্মতারিখ ইত্যাদি দেওয়া থাকে। বই-এর আগাগোড়াই নায়কের এক নাম থাকে। কিন্তু আমাদের নায়কের কথা অত সোজা নয়। প্রত্যেক্ অধ্যায়ে তার নাম বদলাচ্ছে।

অবশ্য আমাদের নায়ককে গোড়া থেকে শুধু 'মানুষ' বললেই হত। কিন্তু কি করে আজকের মানুষ আর সে কালের পিথেক্যানথ্রপাস বা বানর-মানুষকে একই নামে ডাক্‌বে? সিনানথ্রপাস ততটা বানরের মত না হলেও পুরোপুরি মানুষও তো নয়। জার্ম্মানীর 'হাইডেলবের্গ' মানুষ অনেকটা আমাদের মত। তবে সে যে কেমন দেখতে ছিল তা বলা কঠিন। হাইডেলবের্গ শহরে শুধু তার একটি চোয়াল থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারি, সে অনেকটা মানুষের মতই ছিল। ঐ থেকে তাকে হয়তো মানুষ নাম দেওয়া যেতে পারে। তবে তার দাঁত জন্তুর মত নয়—অনেকটা মানুষেরই মত। আগের যুগের পূর্ব্বপুরুষদের দাঁত ছিল অন্য রকম—নীচের

পাটির উপর দিয়ে উপরের পাটি বেরিয়ে আসতো ঠিক বাঘ আর বেরালের মত! কিন্তু এদের দাঁত আমাদের মত। তার তা সত্ত্বেও হাইডেলবের্গ মানুষ খাঁটি মানুষ নয়।

এখানেই তো আমাদের তিনটে নাম হল—পিথে-ক্যানথ্রপাস, সিনানথ্রপাস, হাইডেলবের্গ মানুষ!—আরও শুনবে?—হাইডেলবের্গ-এর পর এল এরিংস্‌ডর্ফ মানুষ

নিয়ান-ডারথ্যাল

(Eringsdorf man), তারপরে নিয়ান-ডারথ্যল মানুষ, (Neanderthal man) তারও পরে ক্রো-ম্যাগনন মানুষ (Cro-Magnon man)।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা শুধু হাইডেলবের্গ মানুষ নিয়ে

আলোচনা করব। এ মানুষরা নদীর ধারে ধারে অস্ত্রশস্ত্র খুঁজে খুঁজে বেড়াতো।—তারাই একটার সঙ্গে আর একটা পাথর ঠুকে কুড়োলের কাজ চালাতো—আর তাদের সেই সব কুড়োলই আজকাল নানা জায়গায় আবিষ্কৃত হচ্ছে।

ক্রো-ম্যাগনন

আমাদের নায়কের নাম দেওয়া যেমন শক্ত তেমনি ঠিক কবে তার জন্ম হল সে কথাও বলা কঠিন। কোনও বিশেষ দিনে বা বছরে মানুষ হঠাৎ মানুষ হয়ে ওঠে নি। পিথেক্যানথ্রপাস, সিনানথ্রপাস ও সত্যিকার মানুষের মধ্যে হাজার হাজার

বছরের তফাৎ রয়েছে। তোমাদের কি মনে আছে যে, পিথেক্যানথ্রপাস প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম জন্ম নেয়? তাহলে আমরা বলব, মানুষের বয়স ঠিক দশ লক্ষ বছর!

সব চেয়ে কঠিন কি জানো? তার জন্মস্থানের ঠিকানা বলা। আমাদের আদিম দিদিমাকে—যার বংশে মানুষ, গরিলা, শিম্পাঞ্জী—এ সবার উদ্ভব—বিজ্ঞানীরা বলেন ড্রাইয়োপিথেকাস (Dryopithecus)। এখন এই ড্রাইয়োপিথেকাস কোনও বিশেষ দেশে থাকতো না। কেউ কেউ বলেন, এরা মধ্য ইয়োরোপে থাকতো। আবার অনেকের মতে উত্তর আফ্রিকা কিংবা দক্ষিণ এসিয়াতেও এদের বসবাস বিচিত্র নয়।

তা ছাড়া, পিথেক্যানথপাসের আর সিনানথ্রপাসের হাড় যে এসিয়ায় পাওয়া যায়, তা আমরা জানি। তা হলেই দেখ এদের জন্মস্থান বলা কত কঠিন। তবে এই সমস্ত নজির দেখে মনে হয় যে, মানুষ এক জায়গায় না জন্মে পুরনো জগতে (অর্থাৎ এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা খণ্ডে) কয়েক জায়গায় জন্মেছিল।

মানুষ সময় পেল

লোহা, কয়লা, আগুন—এ সমস্ত পাওয়া যায় আমরা জানি। কিন্তু সময় কি করে পাওয়া যায় বলতে পার? এর উত্তর

এত সহজ নয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে বহু আগে থেকেই মানুষ সময় পেয়েছে। যন্ত্রপাতি তৈরীর সময় সে এ জগতে এক নতুন জিনিস আবিষ্কার করল—কাজ।

আবার কাজ করতে গেলেই সময় চাই। একটি পাথরের অস্ত্র করতে গেলে উপযুক্ত পাথর প্রথমে খুঁজে পাওয়া চাই। সেই পাথর খোঁজা সহজ কাজ নয়। নদীর তীরে ঘুরতে ঘুরতে হাজার হাজার পাথর বেছে তবেই হয়তো অস্ত্রের উপযুক্ত একটা পাথর মিলে গেল। তার পরে সেই পাথর ভেঙে অস্ত্র করা আর এক কঠিন ব্যাপার। এত সময় সে কোথায় পেত?

আদিম মানুষের সমস্ত সময় কেটে যেত খাবারের সন্ধানে। কেন তাও বলছি। তারা তখন খেত শুধু ফলমূল—কত ফল খেলে যে মানুষের খিদে মিটবে সেটা তোমরাই আন্দাজ কর। সেই পরিমাণে খাবার যোগাড় করতে গিয়ে সারাটা দিন তাতেই কেটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

কিন্তু অস্ত্র আবিষ্কারের পর একটা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল।

অস্ত্র বানাতে একদিকে যেমন সময় লাগল, তেমনি আর এক দিকে অস্ত্র দিয়ে অনেক কঠিন কাজও সহজ হয়ে গেল। যে কাজে আগে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লাগতো—এখন সেখানে অর্দ্ধেক সময়ের মধ্যেই সে কাজ শেষ হতে লাগল। সুতরাং খুব তাড়াতাড়ি খাবার সংগ্রহের কাজ চলতে পারল। অর্থাৎ মানুষ খাওয়া ছাড়া অন্যান্য কাজের জন্যে আরও বেশী

সময় পেল। এই বাড়তি সময়ে সে আরও ভাল অস্ত্র বানাতে থাকল।

সেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে সে তখন শিকার শুরু করে। শিকারে মস্ত লাভ হচ্ছে এই যে, একবার বড় কোনও শিকার পেলে সারাদিনের খোরাক তাতেই হয়ে যেত। বাকী সমস্ত সময় অস্ত্রশস্ত্র বানানো হত।

এযুগে কিন্তু তখনো মানুষ খুব ভাল শিকারী হয়ে ওঠে নি। সে শুধু ভাল ভাল জিনিষ সংগ্রহ করতেই শিখেছে।

যোগাড়ে মানুষ

আমরা সকলেই কিছু-না-কিছু যোগাড় করি। হয়তো ফুল তোলার জন্যে ডালা নিয়ে ছুটলাম চারদিকে। সারাদিন ফুল তুলে কখনো সাজি ভরে উঠল—আবার কোনও দিন বা এমন কপাল খারাপ যে, মোটেই ফুল পাওয়া গেল না। যার ফুল তোলাই চব্বিশ ঘণ্টার কাজ তখন তার দশা দাঁড়ায় কি ?

এ থেকেই বুঝতে পারবে, সে যুগের মানুষের কি দুরবস্থা ছিল। তাদের তো বাড়ীঘর ছিল না যে যখন ইচ্ছে দৌড়ে এসে ভাত খেয়ে আবার ফুল কুড়োতে যাবে! সারাদিন ঘুর-ঘুর করে খাবার খুঁজতো বলে, আর তার উপর খাবার কোনও বাছ-বিচার ছিল না বলেই, মানুষ তখনকার দিনে বেঁচে ছিল।

অন্য কুটুম্বদের চেয়ে অবস্থা ভাল হলেও নিজের দিক থেকে খুব হিংসে করবার মত অবস্থা তখনো ছিল না

তাদের। তা-ছাড়া এক ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে এল মাথার উপর।

এক জগতের শেষ ও আর এক জগতের শুরু

সেই যুগের অনেক ঘটনাবলীর কারণ এখনো আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। তাই এই সব ঘটনা আজও আমাদের কাছে রহস্যে ঢাকা।

তার একটি ঘটনা হচ্ছে বরফের স্রোত। এর আগে আর একবার বরফের স্রোতের উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিক সেই রকম আর একটি প্রবল স্রোত তখন পৃথিবীর বুকে বইতে শুরু করে। সে স্রোতের টানে বড় বড় পাহাড়ের চূড়া ধসে পড়ে, মাটির বুকে গভীর খাদ হয়ে যায়, আর সেই স্রোতের সঙ্গে ভাসতে থাকে প্রচুর আবর্জ্জনা।

বিরাট সৈন্যবাহিনীর মত বরফের স্রোতটি উত্তর দিক থেকে নামতে থাকে। আজও আমরা ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে সে বিরাট অভিযানের চিহ্ন দেখতে পাই।

একদিনেই কিন্তু এ স্রোত বইতে শুরু করে নি। প্রথমে সমুদ্রের জীবজন্তুরা টের পায়। বহু সামুদ্রিক জীব সেই শীতের দাপটে লুপ্ত হয়ে যায়। যারা নতুন করে শীতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারল তারাই শুধু বেঁচে রইল! সমুদ্রের স্রোতে ভেসে আসা কঙ্কাল আজও তার সাক্ষ্য দেয়।

সেই শীতে শুরু হল জঙ্গলের লড়াই। জঙ্গলের সব গাছই এক রকম নয়। ফার গাছ কখনো রোদ্দুরে বাড়তে পারে না। আবার এ্যাসপেন (Aspen) গাছ রোদ্দুর ছাড়া থাকতে পারে না। লোক যখন ফার গাছ কেটে ফেলে দেয় তখন এ্যাসপেন গাছের আনন্দ দেখে কে! সে তরতর করে বাড়তে থাকে! আবার জঙ্গলের মধ্যে এ্যাসপেন গাছের প্রাধান্য হল আর ফার গাছ গেল তলিয়ে। কিন্তু এ্যাসপেন গাছ যখন খুব বড় হয়ে গেল তখন তার পাতার ছায়ার নীচে ফারগাছ আবার বাড়তে লাগল। যতই এ্যাসপেন বাড়ছে ততই ফারও বাড়তে লাগল। যুগের পর যুগ ধরে এই লড়াই চলল, অবশেষে ফার গাছের আবার হল জয়। সংগ্রামের মধ্যে যখন এ্যাসপেন জেতে তখন সমস্ত জঙ্গলের জীবদেরও স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়, কারণ ফারগাছের বন্দীরা তো এ্যাসপেন গাছে থাকতে পারে না।

সেই বরফের স্রোতের অভিযানের ফলাফল হল ভীষণ। যে সব গাছ শীত সহ্য করতে পারে না তারা হয় মরে গেল, নয় তো আরও দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত গরম আবহাওয়ার মধ্যে পালিয়ে এল।

আর মানুষের কি অবস্থা হল? মানুষ কোনও রকমে টিঁকে রইল। যারা গরম দেশে ছিল তারা তো একরকম ভালই ছিল। আর যারা শীতের দেশে ছিল তারা গাছের ডালের আড়াল নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে

কাঁপতে দিন কাটাতে লাগল। ক্ষুধা, শীত আর জংলা জানোয়ার তাদের প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর ভয় দেখাতো। চিন্তা করার ক্ষমতা থাকলে তারা সেদিন নিশ্চয়ই মনে করতো যে, পৃথিবী ধ্বংস হতে বসেছে।

বহু লোকে বহুদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, পৃথিবীর রসাতলে যেতে আর বাকী নেই! মধ্যযুগে একবার আকাশে ধূমকেতু দেখে সবাই ভয়ে ভয়ে বলেছিল, "এবার আর রক্ষে নেই—পৃথিবী ধ্বংস হবেই।"

আবার যখন ভয়ঙ্কর মড়কে দেশের সব উজাড় হয়ে যায় তখনো সকলে একই কথা বলে ঃ ধ্বংসের আর দেরী নেই।

নিজের কক্ষে ঘোরাই হচ্ছে ধূমকেতুর নিয়ম। সেই পথে চলতে চলতে কখনো তা পৃথিবীর লোকের দৃষ্টিগোচর হয়। পৃথিবীর লোক তাকে দেখে কি ভাবছে না-ভাবছে, তাতে তার কিছু আসে যায় না।

আমাদের আরও জানা আছে যে, মহামারীতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় না। সব চেয়ে দরকারী হচ্ছে সেই মহামারীর কারণ জানা। কারণ জানলে আমরা আরও ভাল করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি।

অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরাই যে কেবল পৃথিবী ধ্বংস পাবে বলে, তা নয়, বহু বিজ্ঞানীও অমনধারা কথা বলেন। তাঁদের মতে, ক্রমে উত্তাপের অভাবে মানুষ মরে যাবে। তাঁরা হিসেব কষে দেখিয়ে দেন, পৃথিবীতে

যত কয়লা মাটির নীচে মজুত রয়েছে কিংবা আরও যত রকমের উত্তাপের উপাদান আছে সে সব ক্রমেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। সে সব একেবারে ফুরিয়ে যাবে এমন দিন নাকি খুব দূরে নয়। আমাদের সামনে বিজ্ঞানীরা এরকম নানা ভয়াবহ ছবি এঁকে ধরেন।

এ অনুমান ঠিক নয়। পৃথিবীর সব রকমের শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য্য। যখন অন্য সব শক্তির উৎস ফুরিয়ে যাবে তখন মানুষ সোজা সূর্য্য থেকে শক্তি (energy) আদায় করে কাজ চালাতে পারবে। এখনই একাধিক দেশের অনেক বৈদ্যুতিক স্টেশনে সূর্য্যের শক্তি দিয়ে কাজ করা হয়। সোভিয়েট দেশে সূর্য্যের আলোয় বিস্তর রান্না বান্নার কাজ চলেছে।

কিন্তু এতেও নৈরাশ্যবাদী বিজ্ঞানীরা একটুকু না দমে বলবেন, "কিন্তু সূর্য্য যে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তখন ?"

তার উত্তরে মানুষ বলবে, "ভয় কি ! আদিম মানুষ যদি বরফের স্রোতের ধাক্কা সামলে বেঁচে থাকতে পেরেছিল, তা হলে আমরাও অমনি অবস্থার ঠিক টিঁকে থাকব। শুধু তাই নয়—আমরা শীতকে জয় করব। অণু-পরমাণু থেকে শক্তি আহরণ করে সূর্য্যের কিরণের সহায়তায় কাজ চালাব। এখনো অণু-পরমাণুর শক্তি তেমন করে কাজে লাগানো যায় নি। তখন সেটা ভালভাবে কাজে লাগালেই শক্তির জন্যে আর কোনও ভাবনা থাকবে না।" যাক্, এসব ভবিষ্যতের কথা থাক।

পৃথিবীর আরম্ভ

মানুষ যদি খাদ্য-শৃঙ্খল না ভাঙতো, তা হলে শীতের দাপটে অন্য সব জন্তুর মত তাকেও লোপ পেতে হত! সুখের বিষয়, পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে শুধু পরিবর্ত্তিত হচ্ছিল। মানুষ তার আগের খাদ্যের বদলে নতুন খাবার যোগাড় করতে শিখেছিল। সে অবস্থায় কেবল মানুষই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে পারত। সেই শীতের মধ্যে বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জানোয়ার গরম জামা গায়ে দিতে জানতো না। কিন্তু মানুষ তা জানতো বলেই শীতের কাছে হার মানে নি। শুধু একদিন খেটে খুটে একটা ভালুক মারলেই ব্যস।—তারপর সেই চামড়া গায়ে দিয়ে মানুষ শীত কাটাতো। সেদিনের মানুষ ইচ্ছে করলে আগুন জ্বালতে পারতো। এই ভাবে হাজার হাজার বছরের পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে মানুষও কেবলি নতুন করে গড়ে' বেড়ে' উঠল।

এ সবের নজির আমরা পাই পৃথিবী থেকে। মাটির নীচের প্রতিটি স্তরই যেন পৃথিবী-বইয়ের এক একটি পাতা। আমরা রয়েছি সে বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায়। প্রথম পৃষ্ঠা হচ্ছে সাগর-মহাসাগরের তলায়। যে পাতা আমাদের যত কাছে রয়েছে, আমরা সেই পাতা তত সহজে পড়তে পারি। কতকগুলো পৃষ্ঠা কিন্তু আগুনে পোড়া—গলিত ধাতু লাভায় (lava) ভরতি। তার থেকে আমরা জানতে পারি, কেমন করে মাটির নীচ থেকে

লাভা-স্রোত বেরিয়ে এসে পৃথিবীকে গ্রাস করেছিল। অন্য সব পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে কি ভাবে পৃথিবী-পৃষ্ঠ বন্ধুর অর্থাৎ উঁচুনীচু হয়েছে—কি ভাবে তার বুকে সাত সমুদ্দুর তের নদী সৃষ্টি হল তারই ইতিহাস। এর পরের পৃষ্ঠা অর্থাৎ পরের স্তরে দেখা যাবে ঘন কালো কয়লার মত রং। এই জায়গায় কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লার স্তর দেখে আমরা জানতে পারি, এক কালে পৃথিবীর বুকে মস্ত বড় বড় গাছের জঙ্গল ছিল আর সেগুলোই শীতের চাপে মরে গিয়েছিল। সে-সবই পচে শক্ত হয়ে কয়লা হয়ে গেছে। এই ভাবে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়তে পড়তে আমরা পৃথিবীর জন্মকথা ও তার গড়ে' বেড়ে' ওঠার ইতিহাস জানতে পারি। এই ক্রমবিকাশের শেষ পৃষ্ঠায় জন্মেছি আমরা—মানুষ!

বরফের স্রোতের পাশে পাশে আমরা কালো দাগ দেখতে পাই। সেগুলো গাছের ডালপালা জড়ো করে এককালের মানুষের আগুন জ্বালানোর নিদর্শন। সেই বরফের স্রোতের সাম্নে মানুষ আগুন আর পশু-শিকার সম্বল করেই একদিন রুখে দাঁড়িয়েছিল।

অবশেষে মানুষ জঙ্গল ছাড়ল

সেই শীতের স্রোতের দাপটের পর মানুষ আর জঙ্গলে থাকবার কোনও প্রয়োজন বোধ করল না। তারা তখন রীতিমত শিকার করতে শুরু করেছে। ক্রমেই মাংস মানুষের

খাবারের তালিকায় বেশী করে ঢুকতে লাগল। যতই অস্ত্র-শস্ত্র ভাল করে তৈরী হতে থাকে ততই শিকারের জগতও মানুষের বেড়ে চলল। দুরন্ত শীতের চাপে আত্মরক্ষার তাগিদে যারা ভূ-পৃষ্ঠের দক্ষিণ অঞ্চলে সরে পড়েছিল কেবল তাদেরই যে শিকার না হলে চলে না এমন নয়, ভূ-পৃষ্ঠের উত্তরেও শিকার ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এমন শিকার-ই মানুষ খুঁজতে শুরু করল যার মাংস দিন কয়েক রেখে খাওয়া যায়। সে রকম শিকার—বড় বড় হরিণ, বাইসন, প্রভৃতি জানোয়ার জঙ্গলের বাইরে সমভূমিতে থাকতো। কাজেই মানুষ তার নিজের এতদিনের আবাস জঙ্গল ছেড়ে শিকারের পেছনে ধাওয়া করে সমভূমিতে এসে নামল।

তাদের বসতিও ক্রমেই দিকে দিকে নানা উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আদিম শিকারী মানুষের তাঁবুতে নানা জীব-জন্তুর হাড় পাওয়া যায়। সে সব হাড়ের ভিতর ম্যামথ-ও (Mammoth) পাওয়া গেছে। ভেবে দেখ, ম্যামথের মত বিরাটকায় জীবকে মারতে হলে কি ভীষণ সাহস ও গায়ের জোর দরকার। তার মাথার খুলিটাই তো মানুষের সমান! আজকাল আমরা বন্দুক দিয়ে হাতি মারি—কিন্তু তখন এমনধারা অস্ত্রও কিছু ছিল না। মানুষের একমাত্র সম্বল ছিল পাথরের ধারাল অস্ত্র। তাই নিয়েই সে বড় বড় শিকারে বার হত।

এই কৃতিত্বের মূলে রয়েছে বড় একটা ব্যাপার। একা

মানুষের পক্ষে এসব বিরাট জীব শিকার করা অসম্ভব। তাই মানুষ তখন দলে দলে এক সঙ্গে থেকে, এক সঙ্গে অস্ত্র বানিয়ে, আগুন জ্বালিয়ে শিকার করে, বাড়ীঘর বানিয়ে এক সঙ্গেই বাস করতো। এক সঙ্গে ছিল বলেই তারা মানুষ নামের যোগ্য হয়েছে। ম্যামথের আকার বড় হলেও মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান্ বলেই সে তাদের শিকার করতে পারত। কিন্তু কি ভাবে?

ম্যামথ দেখলেই মানুষের দল আগুন নিয়ে দল বেঁধে তার পেছনে ধাওয়া করতো। মশালের আগুনে চোখ ধেঁধেঁ যাওয়ায় ম্যামথ দিগ্বিদিক ভুলে দৌড়তে থাকতো। মানুষও তার পিছু ধাওয়া করে খেদিয়ে তাকে কাদায় ভরা জলাভূমির দিকে নিয়ে যেত। ঐ বিরাট দেহ কাদায় পড়লে যে কি দশা হবে একবার মনে মনে ভেবে দেখ! এক পা যদি টেনে তোলে তো অমনি কাদার মধ্যে আর এক পা যায় ঢুকে! তখন মানুষ তাকে স্বচ্ছন্দে মারতে পারে। কিন্তু মুস্কিল এই, তাকে টেনে আনবে কেমন করে? বাধ্য হয়েই শরীরের এক-একটা অংশ কেটে মাটিতে তুলতে হত। দশ পনেরো জন লোক তখন একত্র হয়ে উল্লাসে চীৎকার করতে করতে ম্যামথের এক একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে তুলে আনতো। তখন তাদের আনন্দ দেখে কে!

অবশেষে এই ভাবে অন্য সব জীবের সঙ্গে মানুষের এতদিনের প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল দেখা দিল। মানুষ

গাছে বাস করা পূর্ব্বপুরুষেরা—১৭পৃঃ

বিজয়মাল্য পরে জীব-জগতে অপ্রতিদ্বন্দী হয়ে দাঁড়াল। মানুষ তখন সব জন্তুকেই খেতে পারে অথচ মানুষকে কেউ খেতে পারে না। দেখতে দেখতে পৃথিবীতে তখন মানুষের বংশও বাড়তে লাগল।

পশুপক্ষী মানুষের মত এত বেশী সংখ্যায় বেঁচে থেকে বাড়তে পারে না—কারণ তাদের খাবার জিনিসের মোট পরিমাণ খুবই সীমাবদ্ধ! একটা জীব বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে আর দশটা জীবও তো বাড়বে। খাদ্য-শৃঙ্খল রয়েছে বলেই এক জাতের জীব আর এক জাতের পেটেও যাবে বেশী! কাজেই অগুন্তি জন্মালেও শেষ পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে খুবই কম। অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্তুজানোয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধির মোটামুটি একটা সীমা রয়েছে।

কিন্তু মানুষ প্রকৃতির বন্দী দশা থেকে আগেই মুক্তি পেয়েছে। কাজেই দলবল বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে বেশী বেশী খাবারের বন্দোবস্তও সে করতে পারে। সে নিত্য নতুন অস্ত্র তৈরী করতে লাগল। নতুন নতুন খাবার খেতে লাগল। আর বড় বড় পশু শিকার করে সে আরও বেশী লোকের খাওয়ার দায়িত্ব নিতে পারল।

সেই সঙ্গে খাদ্য মজুত করার প্রয়োজনও তার দেখা দিল। কোন দিন একটা বড় জন্তু শিকার করলে সে-দিনেই সেই জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় যাওয়া সম্ভব হত না। বাধ্য হয়ে তাই মানুষকে মাঝে মাঝে অন্তত কিছুদিন এক জায়গায়

থাকতে হত। আরও এক কারণে তাকে এক স্থানে স্থির হয়ে বসবাস করতে হয়েছিল। সেটা হচ্ছে শীতের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা।

এবার মানুষ কোন গুহায় ঢুকে শীতের হাত থেকে বাঁচতে চাইল। শুধু শীত নয়—ঝড়, বন্যা, বৃষ্টি—সবই! তার সেই গুহায় থাকতো আগুন,—শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যও বটে, আবার রাত্তিরে আলো দেবার জন্যও বটে।

এমনি করে মানুষ প্রকৃতির এলাকার মধ্যেই তার নিজের হাতে গড়া দ্বিতীয় একটা প্রকৃতি গড়ে তুলল নিজেরই সুবিধা মত।

হাজার বছরের স্কুল

বাইসন-ম্যামথ শিকারীদের তাঁবুতে দু-রকমের পাথরের অস্ত্র পাওয়া যায়—ছোট আর বড়। বড়গুলি ত্রিভুজাকৃতি পাথরের,—তার দুদিকেই ধার। আর ছোট অস্ত্রগুলি লম্বা সরু ফালির মত, সেগুলোর এক দিকে ধার।

এসব অস্ত্র কি কাজে লাগতো? ঐ দু-রকমের পাথরের অস্ত্রগুলো যখন ধারাল তখন সহজেই বোঝা যায় যে, তারা কাটা ছাঁটার কাজেই লাগতো। বড়গুলো নিঃসন্দেহে কোনও ভারী কাজের জন্যই দরকার হত। কিন্তু ঠিক কি-কি কাজে সেগুলো ব্যবহার করা হত তা সঠিক বলা যায় না। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সে-কথাই জানা।

তা হলে আমাদের কিন্তু সেই প্রস্তর যুগে ফিরে যেতে হবে! সে কি কথা!

একটা ছোট্ট তাঁবু নাও; সঙ্গে খাবার সব বন্দোবস্ত করে ফেল—বন্দুকটি নিতে ভুলো না, কারণ প্রস্তর যুগে সকলকেই শিকার করতে হত। স্টোভ, মাথার টুপি, কাপ, চামচে, কম্পাস, ম্যাপ,—কোনটাই যেন বাদ না যায়! তারপর কাছের কোন বন্দরে গিয়ে টিকিট কেন।

কোথাকার টিকিট? কখনো বলো না যেন প্রস্তর যুগে যাবার টিকিট দেন। তা হলে টিকিট কাটার লোক তোমাদের সোজা রাঁচি পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেবেন। টিকিট চাইবে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মেলবোর্নে যাবার। দেখতে দেখতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তুমি মেলবোর্নে পৌঁছে গেছ। ঐ দেশে এখনো প্রস্তরযুগের লোক বসবাস করে। তাই তোমার সেখানে যাওয়ার এত প্রয়োজন।

শূন্য মরুভূমির ভিতর দিয়ে, মাঝে মাঝে ওয়েসিসের মত তৃণগুল্মের ছায়ার ভিতর দিয়ে তাদের বাসস্থানে যেতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তর যুগের শিকারীরা সেই সব জায়গায় নদীর ধারে ধারে থাকে। চামড়া দিয়ে তাদের ঘরবাড়ী তৈরী।

দেখবে ছেলেরা বাড়ীর সামনে খেলা করছে। মেয়ে-পুরুষ সবাই এক সঙ্গে মাটিতে বসে কাজ করছে। দলের মধ্যে সবচেয়ে দাড়িওয়ালা বুড়ো বসে শিকার-করা ক্যাঙ্গারুর চামড়া

ছাড়াচ্ছে একটা তে-কোণা পাথরের ছোরা দিয়ে। আগে যে ত্রিভুজের মত পাথরের অস্ত্রের কথা বলে এসেছি, বুড়োর ঐ ছোরা ঠিক তেমনটি। তার পাশেই একজন মেয়ে-মানুষ বসে লম্বা পাথরের ছুরি দিয়ে জামা কাটছে। এই অস্ত্রটাই হচ্ছে সেই লম্বা ধারাল ছোট পাথরের ছুরি—যার কথা আগে বলে এলাম।

এ-থেকে কিন্তু মনে করো না, বর্ত্তমানের অস্ট্রেলিয়ার সবাই প্রস্তর যুগের লোক! এদের সঙ্গে সেই আদিম যুগের লোকদের হাজার হাজার বছরের পার্থক্য রয়েছে। এ অস্ত্রগুলো শুধু অতীতের স্মৃতি-হিসাবে এরা বয়ে নিয়ে চলেছে। এদের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি যে, বড় ত্রিভুজের অস্ত্রগুলো পুরুষরাই শিকার করতে ব্যবহার করতো আর ছোটগুলো ব্যবহার করতো মেয়েরা তাদের ঘরের কাজে।

দু-রকমের অস্ত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, সেই আদিম যুগেই মানুষ শ্রম-বিভাগ সম্বন্ধে সচেতন ছিল। কাজের খুঁটিনাটি যতই বাড়তে লাগল, কাজের ধরন-ধারণও ততই হচ্ছিল ঘোরাল —ততই এক-এক জনকে এক একটি বিশেষ কাজ করতে হচ্ছিল। পুরুষ যখন দৌড়ে দৌড়ে শিকার করতো, মেয়েরা তখন নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকতো না। তারাও ঘর তৈরী করা, ফল-মূল যোগাড় করা, আর সংগ্রহ করে আনা জিনিসগুলোর তদারক করা—এমন অনেক কিছু করারই দায়িত্ব পালন করতো।

ছেলে-বুড়োর মধ্যেও কাজের পার্থক্য ছিল।

কিন্তু কোনও কাজ করতে গেলে প্রথমে সেই কাজ শেখা চাই। তা না হলে কেউ হঠাৎ কিছুই করতে পারে না। সেই শিক্ষা অপর কারো কাছ থেকেই নিতে হয়। কতক নিতে হবে জীবিত লোকের অভিজ্ঞতা থেকে, তার চেয়েও বেশী পেতে হবে অতীতের শত-সহস্র জ্ঞানীর আর গুণীর সঞ্চিত শিক্ষার ফলাফল আয়ত্ত করে, নিজের করে নিয়ে। যদি প্রত্যেক মিস্ত্রীকেই করাত আর বাটালি নিজে আবিষ্কার করে কাজ চালাতে হত তাহলে জগতে কোন কালেই হঠাৎ কোন মিস্ত্রী মিলতো না। আজকের একজন দক্ষ মিস্ত্রীর পেছনে রয়েছে বহু বহু যুগের অসংখ্য মিস্ত্রী। যদি ভূগোল শেখবার জন্যে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে হত তাহলে ভূগোল শেখা লোকের মাথায় উঠে যেত!

এমনি করে মানুষ যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই তাদের শিখবার জিনিসও বাড়ছে। প্রায় দুশো বছর আগেও মানুষ ষোল বছর বয়সে অধ্যাপকের কাজ করতো। কিন্তু এখন চেষ্টা করে দেখ, ঐ বয়সে একটা স্কুলের মাস্টারীও জুটবে না! তখন হয়তো তোমরা ম্যাট্রিকুলেশনের জন্যে তৈরী হচ্ছ।

প্রস্তরযুগে অবশ্য এখনকার মত জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে এত ধাঁটাধাঁটি করতে হত না। মানুষ তখন সবে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে তাই জীবনযাত্রায় বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে। মানুষের কাজও তখন এত বিচিত্র ছিল না। তবু তখন থেকেই কিন্তু মানুষকে এক-আধটু মাথা ঘামাতে হচ্ছিল—

শিখতে হচ্ছিল অল্প স্বল্প না-জানা কথা আর না-বোঝা জিনিস।

জীবজন্তুর পেছনে তাড়া করে শিকার করা, বাসা বাঁধা, ছাল ছাড়ানো—সব কাজেই নৈপুণ্য দরকার। এ সমস্তই তাদের শিখতে হত।

এখানেই মানুষের সঙ্গে অন্য পশুর তফাৎ। তারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাপ-মার কাছ থেকে আপনা আপনিই সব পায়। কাজ করবার ধরন-ধারন সবটুকু আর সব কিছুই তাদের বাপ-মার কাছে থেকে অনায়াসে পায়। এক কথায়, তাদের কিছুই শিখতে হয় না।

মানুষ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, কিন্তু সে সব নিয়ে সে জন্মায় না। কাজেই তাকে প্রত্যেকটি কাজই জানতে হয়, শিখতে হয়।

তোমাদের হয়তো এই ভেবে হিংসে হবে যে, পশুপক্ষীর মত সব আপনা আপনি হলে কি ভালই না হত! ব্যাকরণের কঠিন সূত্র মুখস্থ করার জন্যে এত ভাবনা ছিল না, অঙ্ক ভুল হবারও কোন ভয় থাকতো না!—কি মজাই না হত! এগুলো কিন্তু যত ভাল মনে হয় সত্যি তত ভাল নয়। প্রত্যেক স্কুলের ছেলেকেই পড়তে হয়। সারা পৃথিবীময় এই নিয়ম। সমস্ত মনুষ্য জাতিকেই নিত্য নতুন জিনিস শিখতে হচ্ছে। সেটাই হচ্ছে প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে হাজার বছরের স্কুল!

পুরনো কালের শিক্ষিত নিপুণ শিকারীরা তাদের

হঠাৎ শত্রুর সামনে পড়লে গদা আর পাথর নিয়ে দল বেঁধে তারা আত্মরক্ষা করতো। পৃঃ ৩১

ছেলেপিলেদের শিখিয়েছে কি করে ভালকরে শিকার করা যায়। মেয়েদের কাজও শেখাতে হয়েছে তেমনি করে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর ভিতরই নিপুণ লোক থাকতো ভবিষ্যৎ বংশধরদের অনেক কিছু শেখাবার জন্যে।

কিন্তু এসব তারা শেখাতো কেমন করে? তা বোধ হয় তোমাদের একবারও মনে হয় নি। তারা সব বিষয় দেখিয়ে আর বলে বলে শেখাতো।

এজন্য দরকার হল ভাষার। তাহলে তখন লোকে কথা বলতো কেমন করে?

অতীত যুগে·দ্বিতীয় অভিযান

ঘরে বসে যখন রেডিয়োর বোতাম টিপে দেই তখন আমরা স্বচ্ছন্দে এক মুহূর্তে আমেরিকার রাজধানী নিউইয়র্ক বা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের কথা শুনতে পাই; নয়তো সোভিয়েটের শক্তি-কেন্দ্র মস্কোতে চলে যেতে পারি। আর যদি আমাদের টেলিভিশন থাকে তাহলে তো কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বহু বহু দূরের সেই সব বক্তাদেরও দেখতে পাব।

কিন্তু যে সব মানুষের সঙ্গে আমাদের যুগ-যুগান্তের ব্যবধান তাদের কথা কি করে শোনা যায়?

ইথার (ether)-প্রবাহের ভিতর দিয়ে যেমন আমরা যাতায়াত করতে পারি, তেমনি সময়ের ভিতর দিয়ে

চলাচলেরও কি কোন উপায় নেই ? আছে। তা হচ্ছে সবাক চিত্র, যাকে তোমরা টকি বল।

ছবিতে আমরা শুধু এই জগৎটাই দেখি না, অতীত জগতও দেখতে পাই। কিন্তু চলচ্চিত্রের সাহায্যে আমরা কতদূর এগোতে পারি ? টকি এল সবে ১৯২৭ সালে। কাজেই তার আগের কোনও কিছুর প্রমাণ টকির মারফৎ পাওয়া যাবে না।

তাহলে নির্ব্বাক ছবিতে পেতে পারি। কিন্তু সেও খুব বেশী পুরনো জিনিস নয়। ১৮৯৫ সালের আগের কোনও জিনিস বায়স্কোপে থাকতে পারে না। তাহলে গ্রামোফোন ইত্যাদি ? তাও ১৮৭৭ সালের পরের আবিষ্কার। ফোটো ? ফোটোতে ছবি উঠ্‌তে পারে—অঙ্গভঙ্গী সব তাতে দেখতে পাই। কিন্তু তাও তো ১৮৩৮ সালের আগে নয়।

বছরের পর বছর ধরে অতীতের ইতিহাসে প্রবেশ করলে এমনি করে ১৯২৭, ১৮৯৫, ১৮৭৭, ১৮৩৮ প্রভৃতি সন তারিখ একে একে চলে যাবে। এই মিছিলও থেমে যাবে কিছু দূর গিয়েই। ১৪৫৬ সাল ! তার আগে কোনও ছাপা বই পাওয়া যাবে না, তাই তার থেকে কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করাও যাবে না। তখন পাচ্ছি শুধু হাতে লেখা পুঁথি ! যতই অতীতে যাচ্ছি ততই হাতের লেখা অবোধ্য হতে থাকছে। তারপরে কিছু দূর গেলে তারও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। হাতের লেখাও অদৃশ্য হয়ে যাবে ! তখন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নানা

জায়গায় মাটি খুঁড়ে মানুষের চলার চিহ্ন আবিষ্কার করবে। অতীতের যন্ত্রপাতি, বাড়ীঘর, পাথর—এই সব পরীক্ষা করে আমরা শিখি তখনকার মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল।

বাক্যহীন ভাষা

অতীতের গুহায় আমরা যে মানুষের খোঁজ করব তার নাম হচ্ছে "নিয়ানডারথ্যাল মানুষ।" জার্ম্মানীর নিয়ানডারথ্যাল উপত্যকায় ঐ জাতীয় মানুষের মাথার খুলি কুড়িয়ে পাওয়া গেছে বলে এই নাম। এ মানুষেরা ম্যামথ জাতীয় জীবের সমসাময়িক।

এতদিনে মানুষ নামক জীবের মেরুদণ্ড সোজা হয়েছে; হাত আরও সাবলীল, মুখের আদল মানুষের আরও কাছাকাছি।

সাধারণ উপন্যাস লেখকেরা নায়কের রূপবর্ণনা করতেই ব্যস্ত থাকেন। নায়কের চোখ, নাক, মুখের, সারা শরীরের কত না খুঁটিনাটির বর্ণনা থাকে। কিন্তু ভুলেও তাঁরা মস্তিষ্কের কথা উল্লেখ করেন না। আমাদের আবার উল্টো ব্যাপার। আমাদের কাছে মানুষের মস্তিষ্কই প্রধান। চোখের চাউনির চাইতে মস্তিষ্কের ওজন আমাদের কাছে বেশী দরকারী।

হাজার হাজার বছরের শিক্ষা বৃথা যায় নি। এতে গোটা মানুষেরই বিরাট পরিবর্ত্তন হয়েছিল; বিশেষ করে তার

হাতের আর মাথার। কেন না, সমস্ত কাজ করতে হত হাতকে আর সেই হাতকে চালাতো মাথা।

পাথর নিয়ে যখন থেকে মানুষ অস্ত্র-শস্ত্র বানাচ্ছিল তখন থেকেই নিজের অজ্ঞানতে মানুষও কম-বেশী বদলাচ্ছিল। পাথর কাটতে ছাঁটতে তার হাতের আঙুল আরও বেশী চটপটে হল, আরও বেশী অনায়াসে কাজ করার মত করে সেগুলো তৈরী হল। সেই সঙ্গে মস্তিষ্কেরও ক্ষমতা বাড়ছিল। কাজেই নিয়ানডারথ্যাল মানুষকে দেখে কখনোই তোমাদের "বানর-মানুষ" বলে ভুল হবে না। তবু বানর-মানুষের সঙ্গে তার তখনো অনেকটা মিল রয়েছে। নীচু কপাল চোখের উপর ঝুলে থাকে, ঠিক "বানর-মানুষের" মত ; তার দাঁত তখনো বেরিয়ে থাকে। কেবল তার চিবুক আর কপালের দিকেই সে মানুষ থেকে অনেকখানি আলাদা।

নীচু-কপালওয়ালা মাথার খুলিতে তখনো বেশী ঘিলু জমতে পারত না। আবার নীচের মাড়ি আর থুঁতনি ঢালু হয়ে নেমে পড়ায় মানুষের মত ভাষার সাহায্যে কথা বলা সম্ভব হচ্ছিল না।

কিন্তু তবু তাকে 'কথা বলতে' হত। এক সঙ্গে কাজ করতে গেলে তা না করে কোনও উপায় ছিল না। সে তখন নানান অঙ্গ-ভঙ্গী আর ইঙ্গিত-ইশারায় মনের ভাব প্রকাশ করতো। তার মুখের মাংসপেশীই যেন না-বলা কথা বলতো, ঘাড় চালিয়েও মনের কথা বোঝানো চলতো।

তবে হাত দিয়েই তাকে বেশীর ভাগ মনের কথা বলতে হত।

তোমাদের বাড়ীর কুকুরটাকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে, সে সময় মানুষ কি করে মনের ভাব বোঝাতো। কোনও ভাব প্রকাশ করতে হলে কুকুর এক দৃষ্টে প্রভুর দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, নয়তো পা দিয়ে প্রভুর জামা কাপড় টানবে কিংবা নাক দিয়ে তার গা ঘষবে। আবার কখনো দেখবে যে, সে লেজ নেড়ে তার খুশী প্রকাশ করছে। বলতে পারে না বলে বেচারাকে সারা শরীর দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়।

সেই মানুষও এমনি করে হাত-পা নাক মুখ চোখ দিয়েই একদিন কথা বলতো। মনে কর সেদিনের মানুষ অস্ত্র নিয়ে একটা কিছু কাটতে যাচ্ছে। কি করে তা বোঝাবে? হাত দিয়ে কাটার ভঙ্গী করা ছাড়া সেদিন আর কোন উপায় ছিল না। একটা কিছুকে 'দাও' বলতে হলে হাত চিৎ করে এগিয়ে দিত, 'এদিকে এসো' বলতে পারে না বলেই নিজের দিকে টেনে আনবার ভঙ্গী করতো। সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সে ক্রমাগতই গোঙাতো কিংবা চেঁচাতে থাকতো।

তোমরা বলতে পার, এসব সত্যি কথা তো? কেমন করে আমরা এ সব জানলাম?

সেকালের লোকেরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বলেই আমরা

তাদের কিছু কিছু জ্ঞান ও শিক্ষা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। তাই পাওয়ায় আমরা অতীতের সঙ্গে তুলনা করে আগের কথাগুলো বলতে পেরেছি।

ভঙ্গীর ছবি

কয়েক বছর আগে উত্তর আমেরিকার একজন আদিম অধিবাসী ইয়োরোপ দেখতে আসে। সে নেজ পেরসেজ্ (Nez Perces) নামক আদিম জাতির লোক। ইংরাজী আর নিজের মাতৃভাষা সে সমানভাবে বলতে পারত। সাজ-পোষাকেও সে ছিল খাঁটি ইংরেজ। এ ছুটো ভাষা ছাড়া সে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভিতরের অতি পুরাকালের ভাষায়ও কথা বলতে পারত। তার কাছেই এ ভাষার নজীর পাব। এ ভাষা শেখা সহজ। এতে ব্যাকরণের বালাই নেই। উচ্চারণ ভুলের ভয় নেই। উচ্চারণের দরকারই হয় না। এদের ভাষা শব্দ দিয়ে নয়, ভঙ্গী দিয়ে।

ভঙ্গী-ভাষার অভিধানের একটা পাতা

ধনুক—এক হাত কাল্পনিক ধনুক ধরে থাকে ও অন্য হাত তাতে টঙ্কার দেয়।

নেকড়ে বাঘ—হাতের ছুটো আঙুল কানের মত করে দেখানো।

মাছ—হাতের তালু উপুড় করে ঘন ঘন নাড়তে থাকা।

মোটকথা প্রত্যেকটি ভঙ্গীই হাওয়ার বুকে হাত দিয়ে আঁকা ছবি। বর্ত্তমানের আদিম আমেরিকানদের ভিতরের যে ভঙ্গী-ভাষা প্রচলিত তার সঙ্গে এর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে ; এখন এমন কথা আছে যা আগে থাকা সম্ভব ছিল না। যেমন—মোটরগাড়ী—হাত ঘুরিয়ে চাকার মত করে হুস্ করে এগিয়ে যাওয়া ; তারপরে গাড়ীর স্টিয়ারিং চালাবার ভঙ্গী !

তবে এটাও ঠিক যে, এখনো সভ্য জগতে ভঙ্গীভাষা অল্প স্বল্প প্রচলিত রয়েছে ; 'হ্যাঁ,' বলতে হলে আমরা অনেক সময়ই মাথা নাড়ি। 'ওদিকে' কিংবা 'এদিকে' বলতে প্রায়ই আঙুল দিয়ে দেখাই। কারও সঙ্গে দেখা হলে হাত তুলে নমস্কার করি।

থিয়েটারে ভঙ্গীভাষার খুব দরকার। অনেক সময় আকার ইঙ্গিতে এমন সুন্দর করে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়—যা ভাষা দিয়ে বোঝানো কঠিন হয়ে পড়ে।

জাহাজে জাহাজে সিগন্যাল দেবার সময় কথা বলা চলে না। তখন আলো দিয়ে বোঝাতে হয়।

ভঙ্গীর ভাষা এককালে খুবই প্রচলিত ছিল সত্যি। অবশেষে তাকে হার মানতে হল ভাষার কাছে। অনেক অনুন্নত দেশে তো এখনো চাকর কিংবা দাসদের কথা বলতেই দেওয়া হয় না —ভঙ্গী দিয়ে তাদের কাজকর্ম্ম চালাতে বাধ্য করা হয়। এককালে মেয়েদেরও প্রায় সব দেশেই হীন বলে কল্পনা করা হত। এই কিছুদিন আগেও রুশিয়ার ককেশাস প্রদেশে

মেয়েরা পুরুষদের সামনে কথা বলতে পারত না। তাদের তখন ইঙ্গিতে ইশারায় সব কথা বোঝাতে হত। সিরিয়া দেশেও এরকম ভাষার অস্তিত্ব আছে। পারস্যের 'শাহ্'র দরবারেও চাকরদের ইশারায় কথা বলতে হত। সমান সমান না হলে কথা বলবার অধিকার ছিল না। তখন এ সব দুর্ভাগাদের মনের কথা জানাবার ও বোঝাবার সহজ স্বাধীনতাটুকুও ছিল না।

মানুষের মনের জন্মকথা

জঙ্গলের প্রত্যেক প্রাণীই চারদিকে নজর রাখে। কখন কোথা দিয়ে কি উৎপাত ঘটে যায় তার জন্যে তারা সতর্ক থাকতো। খস্ খস্ করে কোথাও একটা শব্দ হল—হয়তো কোনও শত্রু সেখানে লুকিয়ে রয়েছে। শুরু হল মেঘের আওয়াজ আর দমকা হাওয়া—অমনি সে আসন্ন ঝড়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে।

আদিম মানুষও এই ভাবে সব লক্ষণ আগে ভাগে দেখে বুঝে চলা-ফেরা করতো। এ ছাড়াও সে দলের অন্য লোকের সঙ্কেতও বুঝতে শিখে গেল।

মনে কর, কোনও শিকারী হরিণের সন্ধান পেল। সঙ্গে-সঙ্গে সে অন্যান্য সবাইকে হাতের সঙ্কেতে সে কথা জানায়—'প্রস্তুত হয়ে হরিণ অনুসরণ করতে হবে।' তখনো চোখে

হরিণ না দেখলেও তারা বর্শা নিয়ে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ত। মাটিতে হরিণের চলার চিহ্ন যেমন একটা সঙ্কেত, তেমনি হাত নেড়ে সেই চিহ্ন খুঁজে পাবার কথাও হচ্ছে সঙ্কেতের সঙ্কেত।

যতবারই কোনও শিকারী এরকম চিহ্ন খুঁজে পাবে, ততবারই সে অন্যকেও ইঙ্গিত করবে তৈরী হতে। কাজেই এই সব শত্রুদের সঙ্কেত প্রকৃতির দেওয়া সঙ্কেতের সঙ্গে মিশে রইল। আইভ্যান পেত্রোভিচ্ প্যাভলোভ বলেছেন, মানুষের কথা হচ্ছে এমনি সঙ্কেতেরই সঙ্কেত মাত্র।

প্রথম প্রথম ছিল শুধু ভঙ্গী ও চীৎকার। চোখের কানের মারফৎ এই সব সঙ্কেত পেয়েই সেগুলোকে মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেওয়া হত। যেই মস্তিষ্কে সঙ্কেত পৌঁছতো—যেমন ধর কোনও পশু আসছে—অমনি সেখান থেকে আদেশ চলে গেল চোখ, হাত, কান, পা—সকলের কাছে; তারা তৈরী হতে সঙ্কেত পেল। যতই ভঙ্গী বাড়তে লাগল, ততই মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় সমিতির কাজও বেড়ে গেল! এর জন্যে কেন্দ্রীয় সমিতি বড় করবার প্রয়োজন দেখা দিল। তখন ক্রমাগতই মস্তিষ্কে নতুন নতুন কোষ (cell) গড়ে উঠ্‌তে থাকল। এই সব জীব-কোষগুলোর ভিতরের সম্পর্কও ক্রমে হল জটিল থেকে জটিলতর—হয়ে হয়ে মস্তিষ্কের আয়তনও গেল বেড়ে। এজন্যেই পিথেক্যানথ্রপাসের চেয়ে নিয়ানডারথ্যাল-মানুষের মাথা বড়। এতদিনে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা এল।

একসঙ্গে কাজ করতে করতে মানুষ কথা বলা শিখল। কাজ জন্ম দেয় কথার, কথা নিয়ে এল চিন্তা। প্রকৃতি দেবীর দয়ার দান হিসেবে মানুষ চিন্তাশক্তি পায় নি—এ তাকে নিজের গুণে অর্জ্জন করে নিতে হয়েছে।

জিহ্বা ও হাতের মধ্যে কাজ বিনিময়

যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছু ছিল না, এবং যতদিন তার অভিজ্ঞতার দৌড়ও বেশী ছিল না, ততদিন সহজ ভঙ্গী দিয়ে কাজ চালাতে হত। কিন্তু যতই রকমারি কাজের জটিলতা বাড়ল, ততই ভঙ্গীও জটিল হতে থাকল। প্রত্যেক জিনিস বোঝবার জন্যে বিশেষ ভঙ্গী দরকার হল। তখন থেকেই শুরু হল হাওয়ার পটে ভঙ্গীর ছবি আঁকা!

যদি সজারুর কথা বোঝাতে হয়, তাহলে সজারু এঁকেই দেখাতে হয়। মানুষকেই তখনকার মত ক্ষণিকের নকল সজারু সাজতে হয়। সজারুর কানখাড়া করার কায়দা, মাটি খোঁড়ার ধরন, সবই তাকে অঙ্গভঙ্গী দিয়ে বোঝাতে হত। আমাদের কাছে শিকার কথাটা খুবই সহজ শব্দ। কিন্তু তখনকার দিনে কেউ সে কথা বলতে চাইলে তাকে শিকারের সব কাণ্ডকারখানাটা ভঙ্গী দিয়েই দেখাতে হত।

এবার দেখতে পাচ্ছ, ভঙ্গীভাষার বিস্তর সুবিধে থাকলেও তাতে অসুবিধাও বড় কম নয়। সুবিধে বলছি এই জন্য যে, ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে বোঝালে সব জিনিসই খুব পরিষ্কার করে

বোঝানো যায়! আর অসুবিধে হচ্ছে এই কারণে যে, কল্পনার বিষয় ও মনগড়া বস্তু ভঙ্গী দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া, রাত্তিরে কিংবা অন্ধকারের মধ্যে ভঙ্গী দিয়ে কোনো কিছু বোঝান যায় না। এমন কি, দিনের বেলাতেও বনে-জঙ্গলে ভঙ্গী-ভাষায় কথা বলা কঠিন। এ সব অসুবিধা দূর করবার জন্যেই শব্দের ভাষা আবিষ্কারের তাগিদ দেখা দিল।

প্রথম প্রথম জিবের আর গলার কাজ খুব ভালভাবে হয় নি। একটি শব্দ থেকে আর একটি শব্দের পার্থক্য বোঝা কঠিন হত। সে সময়টা শুধুই আওয়াজ আর চিৎকার আর কিচিরমিচিরের যুগ। গোড়ার দিকে ভঙ্গীর কাজে সাহায্য করাই ছিল জিবের কাজ। কিন্তু জিবের জড়তা কাটার সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গীর প্রয়োজন কমে গেল। ভঙ্গী থেকে উদ্ভব বলেই তাই প্রথম স্তরে 'কথা' ভঙ্গীর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। প্রথম দিকে নবজাত কথাবার্ত্তা ছিল পুরোপুরি শব্দ-চিত্রের এক-একটা মিছিল, অর্থাৎ কোনো বিষয় বোঝাতে গিয়ে বিস্তর কথার বা আওয়াজের কসরৎ দেখাতে হত, নইলে যা বলতে চাইছো তা বলাই হত না।

ইভি (Yeve) জাতির ভাষা জান? তারা 'চলা'কে কেবল 'চলা' বলে না। তারা বলে, "জো ঝে ঝে"—মানে ভারিক্কী চালে চলা ; "জো বচো বচো"—মানে মোটা মানুষের মত থপ্ থপ্ করে চলা ; 'জো বুলা বুলা'—মানে তাড়াতাড়ি চলা, "জো গোভু গোভু"—মানে মাথা হেঁট করে চলা!

এসবের প্রত্যেকটি হচ্ছে শব্দচিত্র। কোনও একটা বিশেষ কাজ বোঝানোই এদের কাজ। প্রথমে হল ভঙ্গী-চিত্র; তারপর শব্দ-চিত্র; তা থেকে এল কথা।

এতক্ষণের অতীতের অভিযানে আমরা কি জ্ঞান লাভ করেছি? যুগের পর যুগ কেটে গেছে। সে সময়ে কত জাতির উদ্ভব হয়েছে। আবার কত জাতি জীবজগতের ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছে। তাদের সামান্য স্মৃতিও হয়তো অবশিষ্ট নেই। তখন মনে হয়েছে, হয়তো কালের করাল গ্রাস থেকে মানুষের স্মৃতি-চিহ্ন বাঁচাবার কোনই উপায় নেই। কিন্তু মানুষ তবুও দমে নি। মানুষের অভিজ্ঞতা লোপ পায় নি। কালের দাপট উপেক্ষা করে মানুষের অভিজ্ঞতা তার ভাষায়, তার যন্ত্রে, তার বিজ্ঞানে, তার শিল্পে—নানা কিছুর মধ্যে বেঁচে রয়েছে। ভাষার প্রত্যেকটি কথার, বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে যুগযুগান্তরের অভিজ্ঞতার ছাপ। এই ভাবে আসল মানুষের আবির্ভাব—যে মানুষ কাজ করে, কথা বলে, মাথা ঘামায়।

'বানর-মানুষ' আর মানুষের ভিতর যে হাজার হাজার বছর কেটে গেছে তার কথা ভাবলে ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্‌সের কথা মনে হয়:

"কাজই মানুষের সৃষ্টিকর্তা"।

দ্বিতীয় খণ্ড

মানুষ-দৈত্যের শৈশব

মানুষের শৈশব কি করে কেটেছে, তোমাদের সে কাহিনী শুনতে কৌতূহল হচ্ছে নিশ্চয়ই। সে সব পরিচয় আমরা পাই নানান গুহার প্রমাণ থেকে। ভাগ্যক্রমে বড় বড় পাহাড়ের ভিতরের অনেক গুহা বহু প্রাচীন কালের মানুষের প্রাণযাত্রার সাক্ষ্য বয়ে চলেছে। হাজার হাজার বছর আগে সেগুলোতে ছিল শুধু জল। কারণ, সে সব গুহার একেবারে নীচের স্তরে খুঁজে দেখা গেছে কাদা আর বালুতে ভরতি !

পরে জল কমে গেলে মানুষ সেখানে বাসা বাঁধে। পুরনো পাথরের অস্ত্র থেকে আমরা সে সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পাই। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই সব গুহায় যারা একদিন এসেছিল তারা ছিল শিকারী—ইতিমধ্যে মানুষ শিকার করতে শিখেছিল।

ক্রমে বছরের পর বছর কেটেছে। সেই গুহা আবার জনমানব-শূন্য হয়ে পড়েছিল। এ সময়ের আরো অনেক নিদর্শন থেকে মনে হয় যে, গুহাজীবী ভালুক এসে সেখানে আস্তানা গেড়েছিল।

এর পরের স্তরে আবার মানুষের জীবনযাত্রার চিহ্ন পাওয়া

যায়। কয়লা, ছাই, হাড়গোড়, অস্ত্র-শস্ত্র—এ সব প্রমাণ থেকে মানুষের অস্তিত্বের অনুমান করা হয়।

এখানে এসে সর্ব্বপ্রথম আমরা কয়েকটি নতুন অস্ত্র দেখতে পাব। এই সব আদিম অস্ত্রগুলো থেকেই কালক্রমে ভবিষ্যতে একে একে দেখা দিল পুরোপুরি হাতুড়ি, ছোরা, করাত আর ছুঁচ! অবশ্য তখন হাতুড়ি-হাপর যে ছিল না এমন নয়। তবে সেগুলো পরের যুগের হাতুড়ি-হাপরের কাছে মনে হবে ছেলেমানুষী কাণ্ড-কারখানা। এই কাঁচা হাতের হাতুড়ি পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই সে রকম হাপরও পাওয়া যাবে! গেলও তাই। হাড়ের হাপরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে ঐ সব গুহায়। আমরা এতক্ষণে জানতে পারলাম, শেষের দিকের মানুষ আগের দিকের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। এদের ভিতরে যে হাজার হাজার বছরের ব্যবধান রয়েছে তার মধ্যে মানুষের কাজও হয়েছে অনেক জটিল—কতদিকে কত রকমেরই না কাজ!

বস্তুতই মানুষকে তখন আগের চেয়ে বেশী খাটতে হত। প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে বাঁচবার উপায় বার করতে হত। ভবিষ্যতের জন্য খাবার সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করতে হত। সাজ পোষাক করতে হত। করতে হত এমন আরও কত কি? এজন্য যন্ত্রপাতিও অনেক দরকার হত!

যন্ত্রপাতিও সব আমরা পাইনি। হাজার হাজার বছরের ধ্বংসের হাত থেকে শুধু যে-গুলো বেঁচেছে আমরা

সেগুলোকেই কেবল দেখতে পাই। কাঠের আর চামড়ার জিনিসের তো কোন অস্তিত্বের চিহ্নও নেই—আছে শুধু পাথর আর হাড়ের যন্ত্রপাতি!

আবার তেমনি হাজার হাজার বছর গেল কেটে। এবার মানুষ গুহা ছেড়ে বাইরে এসে বাসা বাঁধল। তারা শিখল ঘর বেঁধে থাকতে। তখন শুধু রাখালেরা গরু চরাতে এসে সেকেলে মানুষের ঐ সব গুহায় বিশ্রাম করতো।

প্রত্যেক স্তরের সঙ্গে আগের স্তরের পার্থক্য আছে। তা থাকবেই। ক্রমেই মানুষ উন্নত হল। ক্রমশঃই ভাল ভাল অস্ত্র তৈরী করে তারা শিকারে বার হত।

লম্বা হাত

বর্শার ফলকে ধারাল পাথর বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হাতের দৈর্ঘ্যও গেল বেড়ে। এবার তার জোর আর সাহস দুই-ই বাড়ল।

আগে ভালুক দেখলে মানুষ পালিয়ে বাঁচতো। তখন তার যতকিছু জারিজুরি ছোট ছোট জানোয়ারদের উপর। কিন্তু বর্শা হাতে পেয়েই মানুষের ক্ষমতা বেড়ে গেল। সে ভয়ে ভয়ে না পালিয়ে ভালুককেই সোজাসুজি আক্রমণ করে বসতো। পেছনের দুই পায়ে দাঁড়িয়ে ভালুক তাকে আক্রমণ করতে যাবে, তার আগেই বর্শা এসে বিঁধতো

ভালুকের গায়। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে দলবল এসে তখন সেই ভালুককে মেরে ফেলতো। হয়তো শুধু বর্শাতেই মানুষের চলতে পারত। কিন্তু তা তো নয়। সে যে নানা জীব-জন্তু শিকার করতো। মানুষের হাত তখনো ঘোড়া, বাইসন, এবং আর সব জানোয়ার শিকার করার মত লম্বা হয় নি।

তখন সে আরও হাল্কা বর্শা তৈরী করল। কাঠের সঙ্গে লাগানো হাড়ের তৈরী এই সব ছোট ছোট বর্শা অনেক দূরে ছোঁড়া যেত। কাজেই তখন থেকে জীবজন্তু শিকার অনেক সহজ হয়ে এল। দূর থেকে শিকারী দেখে শিকারের জন্তুর আর পালিয়ে যাবার জো নেই। অবশ্য সে সব জন্তু জানোয়ার শিকারের জন্যে হাত সই চাই। তাই ছোট বেলা থেকেই মানুষ লক্ষ্যভেদ শিখতে শুরু করল।

কিন্তু মানুষ এতেও সন্তুষ্ট হল না। সে আরও জোরে, আরও বেগে ছুঁড়ে মারা যায় এমন সব অস্ত্র বানাতে চাইল যা দিয়ে আরও দূরের শিকার অনায়াসে মারা যায়। তখন দেখা দিল ধনুক। ধনুকের জ্যা টেনে নিয়ে এলে হাতের মাংসপেশী থেকে ঐ জ্যাতে শক্তি সঞ্চারিত হয়। তারপরে হাত ছেড়ে দিলেই সবটুকু শক্তি গিয়ে পড়ে তীরের উপর। সেই তীর তখন চোখের পলকে উড়ে বেরিয়ে যায়। ছোট বর্শা আর তীর দেখতে অনেকটা এক রকম। তাই বলে তারা এক কিংবা একই সময়ের নয়। এদের দুয়ের মধ্যেও হাজার

হাজার বছরের ব্যবধান। যাক্ এবার মানুষের হাতের শক্তি হল অসম্ভব। সে সত্যি সত্যি হয়ে উঠল দৈত্য।

জীবন্ত ঝরণা

ফ্রান্সের সলুত্রে (Solutre) বলে জায়গায় এক গভীর পাথুরে খাদ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সে জায়গা খুঁড়ে এক গাদা হাড় পান। তার ভিতরে ম্যামথ থেকে আদিম গরু ভেড়া, এমন কি, গুহাবাসী ভালুক পর্য্যন্ত নানান জীবের হাড় আর মাথার খুলি পাওয়া গেছে। তবে এসবের বেশীর ভাগই ঘোড়ার হাড়। স্থানে স্থানে পুরো কয়েক ফিট গভীর হয়ে জমে রয়েছে হাড়গোড়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে সেখানে লক্ষলক্ষ ঘোড়ার কঙ্কাল জমে আছে।

এতগুলো ঘোড়ার হাড় এখানে জমল কি করে? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার সময় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা লক্ষ্য করেন, ঐ হাড়গোড়ের অনেকগুলোই ভাঙা, নয় তো থেঁতলান। অনেকগুলো আবার পোড়ানো। তা থেকে মনে হয় যে, ঐ সময় অসংখ্য ঘোড়া পোড়ানো হয়েছিল। অনুসন্ধানের পর আবিষ্কৃত হয় যে, ওগুলো সত্যিই কোনও ঘোড়ার কবর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ওগুলো ছিল রান্নাকরা আবর্জ্জনা-স্তূপ!

এত বিরাট আবর্জ্জনাস্তূপ কখনই একদিনে জমতে পারে না।

সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি যে, এই অঞ্চলে বহুযুগ ধরে লোক বাস করতো। অন্য সমভূমি ছেড়ে এখানে বাস করার কারণও রয়েছে।

মনে কর, কোনও শিকারী দূরের জঙ্গলে একপাল ঘোড়া দেখতে গেল। সে তৎক্ষণাৎ সঙ্কেত করে সবাইকে জানিয়ে দিল তৈরী হতে। তারপরে তিনদিক থেকে শিকারীরা ঘোড়াগুলোকে তাড়া করতে লাগল। ঘোড়াগুলোও ভয় পেয়ে পালাবার জন্যে তৈরী হতে চাইল কিন্তু তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে খুদে বর্শা এসে তাদের গায়ে পড়ছে। শত্রুকে না দেখলেও বর্শার ঘায় তারা জর্জ্জরিত হল। তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ঘোড়োগুলো সেই পাহাড়ের খাদের দিকে দৌড়য়। শিকারীরা তো তাই চায়। তারাও তখন চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে সেই জীবন্ত নদীর স্রোতের মত ঘোড়ার পালকে তাড়া করল।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে ঘোড়ার পাল ছুটছে; আকাশে উড়ছে লেজ, সারা শরীর ঘামে ভরে গেছে, বর্শার আঘাতে আঘাতে জর্জ্জর তাদের সারা শরীর! হঠাৎ এ কী ভীষণ গভীর খাদ! থামবার উপায় নেই। এক পাল এসে চম্‌কে থামার আগেই পেছন থেকে আর একটা দল তাদের উপর হুড়মুড় খেয়ে পড়ল, ফলে, ধাক্কার পর ধাক্কা এসে যে কী কাণ্ড ঘটে যায় তা বুঝতেই পারছো! দেখতে দেখতে গোটা দলটাই ঝরণার মত নামতে থাকে উপর থেকে নীচে! দেখতে

গোটা দলটাই ঝরণার মত নামতে থাকে

দেখতে নীচে জমে গেল বিরাট মরা ঘোড়ার স্তূপ।

এতক্ষণে শিকারও শেষ হল। পাহাড়ের চূড়ার নীচে তখন জ্বলে উঠল আগুন, বুড়ীরা সেই শিকার ভাগ করতে বসে গেল। ঐ সমস্ত শিকার কিন্তু কারো একলার নয়—তাদের দলের সকলেরই সমান অধিকার। অবশ্যি দলের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী আর দক্ষ শিকারীরা পেল বেশী অংশ।

নতুন মানুষ

ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটার দিকে তাকিয়ে থাকলে মনেই হবে না যে সেটা চলছে। তারপরে ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেই নজরে পড়ে সেটা নড়ছে। জাতির জীবনেও ঠিক এমনি হয়। সাধারণতঃ আমাদের চারদিকে এবং নিজেদের মধ্যেই যে পরিবর্ত্তন ঘটছে আমরা তা বিশেষ লক্ষ্য করি না। ইতিহাসের ঘণ্টার কাঁটাটা মনে হয় যেন স্থির হয়ে রয়েছে। এমনি ভাবে অনেক দিন চলার পর যেন হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করি যে, ঘণ্টার কাঁটাও চলেছিল আর আমরাও সেই সঙ্গে চলেছিলাম এবং চারপাশের সব জিনিসও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই বদলিয়েছে।

আমাদের ডায়েরী আছে, ফটোগ্রাফ রয়েছে, অনেক পুরনো জিনিসের সঙ্গে নতুনের তুলনা আমরা করতে পারি।

কিন্তু সেকালের লোকদের সে সুযোগ ছিল না। তাদের কাছে মনে হত, সময় আবার চলবে কি? সময়ের না আছে শুরু, না আছে শেষ—তাই সব সময়ই যেন আমরা একই সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি, সে সময়ের না আছে কোন বিকার, না কোন পরিবর্ত্তন। অর্থাৎ সময় বা কালকে মনে করা হত অপরিবর্ত্তনীয়।

তখন প্রত্যেক কারিকরই যে জিনিস বানাতো তা হুবহু আগের মতই করতে চাইতো। কিন্তু তা হলে কি হয়। তবুও মানুষের নিজেরই অজান্তে ক্রমশই তার যন্ত্রপাতি, বাসস্থান আর কাজের ধরনধারন বদলাচ্ছিল। প্রত্যেক নতুন যন্ত্রই প্রথমে হুবহু পুরনো জিনিসের মত দেখতে হত। প্রথম দিকের সেই খুদে বর্শার সঙ্গে পরবর্ত্তী বর্শার বড় একটা প্রভেদ নজরে পড়তো না। কিন্তু তবু দুটো পৃথক জিনিস তো বটেই! তীর ধনুক নিয়ে শিকার করা আর বর্শা দিয়ে শিকার করা এক কথা নয়।

শুধু যে মানুষের তৈরী যন্ত্রপাতিরই পরিবর্ত্তন হল তা নয়। মানুষ নিজেও কম বেশী সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে বদলে গেল। প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার ফলে নানা কঙ্কাল থেকে এ বিষয়ে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া গেছে। নিয়ানডারথ্যাল মানুষ তখনো পিঠের দিকে কুঁজো ছিল। তার চলার ভঙ্গীও ছিল বিদঘুটে। কিন্তু 'ক্রো-ম্যাগনন' মানুষ একেবারেই সোজা। আমাদের সঙ্গে তার বাইরেকার তফাৎ প্রায় নেই বললেই

হয়। কিন্তু ও দু-জাতের মধ্যে এত তফাৎ যে, একদল প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে ক্রো-ম্যাগনন মানুষের সঙ্গে নিয়ানডারথাল মানুষের কোনই সম্পর্ক নেই। আসলে কিন্তু তা নয়। এক জাত থেকেই আর এক জাতের উৎপত্তি।

ঘর-বাঁধার গোড়ার কথা

মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তার বাসগৃহও বদলাল। মানুষ প্রথমে প্রকৃতির দেওয়া তৈরী গুহায় বাস করতো। কিন্তু সে সব গুহা সব সময় সুবিধে মত হত না বলেই মানুষের দল ধীরে ধীরে তাকে অদল-বদল করে নিজেদের উপযোগী করে নিয়েছিল। গুহায় ঢোকার মুখেই এক পাশে গর্ত্ত করে উনুন বানান হত। আর একটু ভিতরের দিকে থাকতো বাচ্চা-কাচ্চাদের শোবার জায়গা। মাটিতে গর্ত্ত করে তা ছাই দিয়ে ভরে তুলে বিছানা পাতা হত।

যত দিন গেল, ততই মানুষ তাদের বাসস্থানের উন্নতির দিকে নজর দিতে লাগল। কোনখানে পাহাড়ের চূড়া মাথা একটু বার করে রেখেছে দেখতে পেলেই তারা সেখানে দেওয়াল তুলে নিতে শিখল। কিংবা কোথাও দেওয়ালের মত পাহাড় পেলে তারা লতাপাতার ছাদ গড়ে নিত।

এরকম আদিকালের ঘরদোর দক্ষিণ ফ্রান্সের এক জায়গায় আছে। সেখানকার লোকেরা তার নাম দিয়েছে "ভূতুড়ে

উনুন"। তাদের ধারণা, ভূত ছাড়া আর কে সেখানে অতবড় পাহাড়ের মধ্যে আগুন পোহাতো। কিন্তু নিজেদের পূর্ব্বপুরুষদের ইতিহাস একটু জানা থাকলে তারা বুঝতে পারত, ওসব ভূতের কাজ নয়, মানুষই সে সব তৈরী করেছিল।

এই ভূতের উনুনের অর্দ্ধেকটা ঘর আর বাকি অর্দ্ধেক গুহা। পাহাড়ের চূড়া হয়েছে ছাদ আর পাহাড়ের ঝুলে-পড়া দুটো দিকে হয়েছে দুটো দেওয়াল—বাকী দুটো দেওয়াল মানুষ নিজেই গড়েছে।

একবার দুটো দেওয়াল গড়তে পারলে মানুষ তারপরে নিশ্চয়ই চারটে দেওয়াল গড়তে শিখবে। হলও তাই। এর কিছু পরেই আমরা খোলা আকাশের নীচে মানুষের তৈরী চার দেওয়ালের ঘর দেখতে পাই। তখনকার ঘর অবশ্য এখনকার মত নয়। এখনকার ঘরবাড়ীর তুলনায় সেগুলো দেখতে ছিল ছোটখাট গর্ত্তের মত। আদিম মানুষেরা খুব গভীর গর্ত্ত করে ঘর বানাতো। চারপাশের দেওয়াল যাতে না পড়ে যায় সেজন্যে বড় বড় ম্যামথের দাঁত দিয়ে তাতে ঠ্যাকা দিত। ডালপালার উপরে মাটি লেপে তারা ছাদ তৈরী করে বরফের আর ঝড়ের হাত থেকে নিজেদের ঘর বাঁচাতো। দূর থেকে দেখতে পাওয়া যেত শুধু মাটির ঢিপির মত ছাদ। ঢোকবার পথ ছিল মাত্র একটি। তাও ছাদের উপরের গর্ত্ত দিয়ে যত রাজ্যের কালিঝুলির ভিতর দিয়ে। ম্যামথের চোয়ালের হাড় দিয়ে তারা বেঞ্চির কাজ চালাতো। মাটিই

ছিল তাদের বিছানা, কাঠ দিয়ে চলতো বালিশের কাজ। উনুনের পাশে বেশী আলো থাকতো বলে তারা সেখানেই পাথরের চাকতি বসিয়ে টেবিল বানাতো। পুরনো ঘরের ঐ রকম টেবিলের উপর টুকিটাকি, নানা জিনিসপত্তর পাওয়া গেছে। তার ভিতর মস্ত বড় ছ্যাঁদা করা একটা সরু হাড়ও আছে। জিনিসগুলো এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যে, দেখলেই মনে হয় এখুনি লোকেরা কাজ করতে করতে বাইরে গেছে। হয়তো হবেও তাই। সত্যি সত্যি কোনও বিষম ভয়ের আশঙ্কায় সেই গুহার লোকেরা কাজকর্ম্ম ফেলে রেখে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে—আর ফেরে নি।

সে জিনিসগুলো করতে, কম খাটতে হয় নি তাদের। ছুঁচের কথাই ধর না। ওটাই তো মানুষের ইতিহাসের প্রথম ছুঁচ! তোমরা দেখলে মনে করবে, এ আবার এমন কি? কিন্তু ওইটুকু করতেই যে কত বুদ্ধির দরকার হয়েছে তা কল্পনাও করতে পারবে না। হাড় কাটবার ছোরা দিয়ে তারা খরগোসের সরু হাড় কেটে বার করতো। পাথরে ঘষে সেই হাড়ের আগা ছুঁচাল করতো। তারপরে অন্য একটা খুব সরু পাথর দিয়ে সেই হাড়ের আর এক মাথায় করা হত ফুটো! এত সব কাজ হয়ে গেলে—সেই ছুঁচের হাড়টা বড় পাথরে ঘষে পালিশ করে একেবারে দস্তুরমত ছুঁচ বানিয়ে নিত। তাহলেই দেখ যে, সামান্য একটা ছুঁচ করতে তখন কত রকমের যন্ত্রপাতি লাগতো। যে কোনও লোকই কিন্তু ছুঁচ

বানাবার কায়দা জানতো না। যারা খুব চালাক, শুধু তারাই এসব বানাতে পারত বলে খুব যত্ন করে তাদের সব যন্ত্রপাতির তদারক করতো।

আরও ভাল করে দেখা যাক, কি করে তারা তখন দিন কাটাতো। দেখা যাবে যে, সমস্ত বাড়ীগুলোর মুখ থেকে অফুরন্ত ধুঁয়া উঠছে! ধুঁয়া চোখে সয়ে গেলে ভিতরের মানুষদের চেহারা স্পষ্ট করে নজরে পড়বে। তারা দেখতে আর একটুকুও 'বানর-মানুষের' মত নয়। মেঝেয় বসে মেয়েরা চামড়ার জামা সেলাই করছে। ছেলেমেয়েরা চারদিকে ছড়ানো হাড় নিয়ে খেলছে।

এককোণায় চওড়া বড় হাড়ের উপর আর একজন ছবি আঁকছে। কয়েকটী আঁচড় দিয়ে সে ঘোড়ার মূর্ত্তি আঁকল। এমন নিখুঁত ভাবে অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে সে ঘোড়ার মূর্ত্তি আঁকল তা দেখে একেবারে জীবন্ত ঘোড়া বলে ভুল হয়।

ঘোড়া আঁকা হয়ে গেলেও কিন্তু পটুয়া থামল না। ছবির উপর আড়াআড়ি করে কয়েকটা আঁচড় টানল। প্রথমে মনে হবে যে, এত সুন্দর ঘোড়ার ছবি এভাবে নষ্ট করছে কেন এরা? কিন্তু অনেকক্ষণ পরে দেখবে যে, ঐ দাগগুলোর সব নিয়ে এক অস্পষ্ট কুঁড়ে ফুটে উঠেছে। কোনো ম্যামথের ছবির উপর দেখবে দুটো কুঁড়ে আঁকা—কোনো বাইসনের উপর হয়তো তিনটে! গুহার দেয়ালের গায়েই হত বেশী ছবি আঁকা। গুহার ভিতরে গেলে সেগুলো ভাল করে নজরে পড়বে।

মাটির নীচে ছবির গ্যালারী

গুহার ভিতর অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের লণ্ঠন হাতে নিয়ে যেতে হবে। যাবার সময় প্রত্যেকটি অলিগলি মনে রাখতে হবে। আর লণ্ঠন উচু করে আমাদের সব সময় দেওয়াল পরীক্ষা করতে হবে। আমরা খুঁজেই চলেছি, এমন সময় হয়তো কেউ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এই যে, এদিকে ছাখ!'

ফিরে দেখি দেওয়ালের গায়ে লাল আর কালো রং-এ আকা এক বাইসনের ছবি। গায়ে তার খুদে বর্শা বিঁধে রয়েছে। সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে সে! বহুক্ষণ ধরে সেইখানে দাঁড়িয়ে হাজার-হাজার বছর আগের নাম-না-জানা শিল্পীর আঁকা ছবি দেখতে লাগলাম।

একটু এগিয়ে গিয়ে আবার নতুন ধরনের আর একটা ছবি চোখে পড়ল। একটা দৈত্য যেন নাচছে। সে দেখতে অনেকটা জানোয়ারের মত কিংবা জানোয়ারই যেন মানুষের মত করে আঁকা রয়েছে। দৈত্যের মুখে দাড়ি, মাথায় একজোড়া শিং। তার লেজটা বেশ লোমশ আর তার পিঠের উপর রয়েছে একটা কুঁজ।

ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, কোন মানুষই বাইসনের চামড়া পরে ছদ্মবেশ ধরেছে। এর পরেই এক-দুই করে ঐ রকম বহু ছবি।

মাটির নীচে ছবির গ্যালারী !

এগুলোর মানে কি? শোন তবে—

"কয়েকজন শিকারী মিলে নাচছে। প্রত্যেকের গায়ে বাইসনের চামড়া, মাথায় শিং। প্রত্যেকেরই হাতে তীর ধনুক আর বর্শা। এরা বাইসন শিকারের অভিনয় করছে। নাচতে নাচতে পরিশ্রান্ত হয়ে কেউ যখন পড়ে থাকার ভাণ করে, অন্য কেউ তখন তাকে ভোঁতা তীর ছুঁড়ে মারে। তারপরে সবাই মিলে তার পা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এসে তার চারপাশে ছোরা ঘোরাতে থাকে। অবশেষে তাকে ছেড়ে দিয়ে আবার তারা আর একজনকে নিয়ে পড়ে।"

এই নাকি আদিম যুগের শিকার-নাচের অর্থ। এই অদ্ভুত নাচ একটানা দু-তিন সপ্তাহ ধরে চলতো। একবার একজন পর্য্যটক উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভিতর এই নাচ দেখেছিলেন। এ নাচের আবার বিশেষত্ব আছে। এ ঠিক সাধারণ নাচ নয়। এ নাচের তদারকের ভার নিত কোনও যাদুকর। তার কথামত সবাইকে নাচতে হত। সত্যি কথা বলতে গেলে ওগুলো ঠিক নাচও নয়। যাদুকর যেখানে নাচের কর্ত্তা, সে নাচকে নাচ বললে ভুল হয়। এ সব নাচ ভূতুড়ে তুকতাক ও ওঝালি কাণ্ডকারখানা বৈ আর কিছু নয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাইসনকে যাদু করে শিকারের ফাঁদে ফেলা! তাই তারা ঘর থেকে বেরোবার আগে একবার ঘটা করে শিকারের উৎসব সেরে নেয়। শিকারে যা পেতে চায় আগেভাগে

উৎসবে তা দেখাতে চায়। শিল্পীও তাই শিকারের আগে দেওয়ালের গায়ে মাঠের শিকারের ছবি এঁকে রেখে যায়।

পূর্ব্ব পুরুষদের সঙ্গে আলাপ

ছেলেবেলায় আমরা ঘুমন্ত রাজকন্যা ও রাজপুত্রের কথা শুনেছি। আরব্যোপন্যাসের কাহিনীও পড়েছি। এগুলো বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে, পৃথিবীময় নানা রকম রহস্যময় জীব রয়েছে। কেউ কাউকে শুধু চোখে দেখেই চিনতে জানতে ভরসা পাচ্ছে না। হঠাৎ কুৎসিত ব্যাঙ্‌ই হয়তো এক পরমাসুন্দরী কন্যা হয়ে তোমার সঙ্গে সুখ দুঃখের কথা কইবে। কিংবা সুন্দর এক তরুণ যুবক চোখের নিমিষে হয়তো অজগর হয়ে গেল।

এসব আজগুবি কাণ্ডকারখানার উপকথা পড়বার সময় সেগুলো বিশ্বাস না করে পারা যায় না। কিন্তু বই বন্ধ করলেই আবার আমরা সত্যিকার জগতে ফিরে আসি। পরীর রাজ্য যত চমৎকারই হোক না, আমরা কিন্তু সারাদিন সেখানে থাকতে চাই না।

কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে পৃথিবীটা সত্যি অমনি মনে হত। তারা বাস্তব আর কাল্পনিক জগতের পার্থক্য জানতো না। তাদের মনে হত, সব কিছু ভাল আর মন্দ এই দুই রকমের অদৃশ্য শক্তির চালনায় ঘটে। হোঁচট খেলে আমরা অসাবধানতার দোষ দেই; আর তারা এক অদেখা অপদেবতার ঘাড়ে দোষ দিত। কেউ

ছোরার ঘায় মারা গেলে আমরা বলি, সে ছোরা খেয়ে মারা গেছে। কিন্তু সে যুগের লোক বলতো, ছোরাটায় নিশ্চয় যাদু করা ছিল, সেই তুকতাকেই সে মারা পড়ল! অবিশ্যি এখনো এমন লোক আছে অসুখ করলে যে মনে করে যে অমুকের নজর লেগেছে। তাকে আমরা হেসে উড়িয়ে দিই। এসব কুসংস্কারের কথা শুনলে আমাদের হাসি চাপা কঠিন হয়!

তাই বলে পূর্ব্বপুরুষদের কিন্তু দোষ দেওয়া যায় না। কোনও ঘটন-অঘটন হলে তখন তার একটা কারণ খুঁজে না পেয়ে সেই পূর্ব্বপুরুষেরা যা-হোক্ কোন কারণ দাঁড় করাতে চাইতো। মানুষের স্বভাবই এই যে, কেন হয়, কি করে হয় ইত্যাদি না-জানা অবধি মনে মনে স্বস্তি পায় না। অথচ প্রকৃতির রাজ্যে সহস্র রকমের কাণ্ডকারখানা ভাল করে বুঝবার মত জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার তখনও আমাদের মত ভরে ওঠে নি। তাদের জ্ঞানের পরিধি তখন খুব কম ছিল বলেই তারা ওরকম ভুল ব্যাখ্যা দিত, তুকতাকে বিশ্বাস করতো।

একবার নিউগিনি দ্বীপের 'মতু-মতুস' জাতির মধ্যে ভীষণ মহামারী দেখা দেয়। দলে দলে লোক মরতে থাকে। প্রত্যেক বাড়ী থেকে কান্না উঠতে লাগল। গোটা জাতিটাই ভয় পেয়ে মুষড়ে গেল। তারা ভাবতে লাগল, কেন এমন হল? অনেক ভেবে তারা একটা কারণও আবিষ্কার করল। সেখানে কয়েকজন সাহেব আসার পর থেকেই এই মহামারী দেখা দিয়েছিল। অতএব সাহেবরাই যত নষ্টের

গোড়া! তাদের মার, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—এই হল তাদের ধারণা।

সঙ্গে সঙ্গে তারা পাদ্রী সাহেবের বাড়ী এসে চড়াও করল। সে বেচারা তো প্রাণের ভয়ে অস্থির। নানা অঙ্গভঙ্গী করে সে তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিল! কিন্তু তাতে ফল বিশেষ হল না। এমন সময় একটি ছাগল তাদের নজরে পড়ে। ছাগল দেখেই তাদের চিন্তাধারা বদলে গেল। তা হলে কি এই ছাগলটাই দায়ী! অমনি সেই ছাগল মেরে তারা উৎসব শুরু করল; কিন্তু মহামারী তাতেও থামল না।

আবার সেই পাদ্রীর উপর চড়াও হল তারা। এবার আর নিস্তার নেই। পাদ্রীকে মারতে এসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি ছবি তাদের নজরে পড়ল। তখন সেই ছবি ভেঙেচুরে ফেলেই তারা মহামারীর হাত থেকে বাঁচতে চাইল!

এ গল্পটি থেকে আমরা বেশ বুঝতে পারি, প্রকৃতির নিয়ম-কানুন ভাল করে জানা না থাকলে ঘটনার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কত না অদ্ভুত ধারণা জন্মে। ক্রমে অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ জানতে পারে, পৃথিবীতে সব কিছুই এক যোগসূত্রে গাঁথা। তা না জানায় কেউ মনে করে এটা যাদুবিদ্যার কাজ, ওটার পিছনে কোন অদৃশ্য শক্তি রয়েছে নিশ্চয়—এই রকম কত কি।

কোনও নতুন জিনিস দেখলেই তখনকার লোক ভোজবাজি বলে মনে করতো। আর তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে

ব্যবহার করতো তাবিচ-কবচ। নানারকম পাথরের টুক্‌রো, বিশেষ বিশেষ জীবজন্তুর বিশেষ অঙ্গের হাড়-গোড়, গাছ বা আগাছার শিকড়—এমন কত রকমের তুকতাক আর ঝাড়ফুঁক ছিল তখন। তাবিজ-কবচের ব্যবহার তো আমাদের দেশে এখনো অনেক জায়গায়ই দেখা যায়।

জগত সম্বন্ধে পূর্বপুরুষদের ধারণা

প্রাকৃতিক নিয়মাবলী জানা না থাকলে কারুর পক্ষে পৃথিবীতে চলা সহজ নয়। প্রতিপদে অদৃশ্য শক্তির সামনে নিজেকে অসহায় ও দুর্ব্বল মনে হবে। যে লোক একটু অদ্ভুত কাজ করবে, অমনি তাকেই লোকে যাদুকর, নয় তো, ওঝা-ডাইনী বলে ভয় পাবে।

অজ্ঞতা থেকে আসে ভয়। মানুষ এতদিন আজকের মত অনেক কিছু জানতো না বলেই পৃথিবীর বুকে খবরদারি না করে ভয়ে ভয়ে থাকতো। অবশ্য মানুষ তখন ম্যামথ মারতে শিখেছিল। কিন্তু প্রকৃতি দেবীর অসীম শক্তির কাছে সেই শক্তি তুচ্ছ। একদিন শিকারে কিছুই না জুটলে গোষ্ঠীসুদ্ধ সকলকে সেদিন না খেয়ে থাকতে হত।

কিন্তু এমন অসহায় অবস্থা থেকে মানুষ কি করে প্রকৃতির নানা বাধা জয় করল?

মানুষের শক্তির মূল উৎস ছিল একতা। এক সঙ্গে দলবদ্ধভাবে সে প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে

সংগ্রাম করতো। সমাজ কাকে বলে সে বিষয়ে তখন তাদের কোনও ধারণা ছিল না। কিন্তু তারা এইটুকু অনুভব করতো যে, কোনও অদৃশ্য বন্ধনে তারা সবাই আবদ্ধ। তারা বুঝতে পারত যে, তারা সকলে আলাদা বহু হলেও কেমন করে যেন এক। মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো পৃথক হয়েও যেমন এক হয়ে আছে তেমনি এক অস্পষ্ট ধারণা তাদের মধ্যেও ছিল।

কি সেই বন্ধন? মানুষ তখন আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। ছেলেরা বাপ-মার সঙ্গে থাকতো। তাদের ছেলেরা আবার ভাই-বোন, খুড়ো, ভাইপো, এক সঙ্গে থাকতো। এই ভাবে কুলের উৎপত্তি হয়। আদিম শিকারী মানুষদের সমাজ ছিল ঐ রকম এক-পূর্ব্ব-পুরুষ থেকে নেমে আসা এক কুল। জন্মসূত্রে লোকে একে অন্যের সঙ্গে আবদ্ধ থাকতো। শিকার করা, যন্ত্রপাতি বানানো তারা পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে শিখতো।

মানুষ তখন মনে ভাবতো, কাজ করলে আর শিকার করলেই পূর্ব্বপুরুষদের আদেশ পালন করা হয়। তাঁদের আদেশ যারা শুনতো কেবল তারাই কোন বিপদে পড়তো না। অদৃশ্য ভাবে পূর্ব্বপুরুষেরা সব সময় বংশধরদের রক্ষা করে চলেছেন। সমস্ত জিনিসই মৃত পূর্ব্বপুরুষেরা জানতে পারেন এবং তাঁদের চোখ এড়িয়ে কোন কিছু করবার উপায় ছিল না। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনই তাঁদের কাজ।

এই ভাবে আদিম মানুষের মনে সকলের ভালর জন্য সকলে মিলে কাজ করার তাগিদ এল। ঐ একতার বোধ পূর্ব্বপুরুষের আদেশ পালনেরই নামান্তর।

আমাদের কাজের ধারণা নিয়ে যেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাজের বিচার না করি। কারণ তাদের ধারণা ছিল অন্য রকম। আমাদের মতে বাইসন শিকার করে শিকারীরা খাবার বন্দোবস্ত করে। কিন্তু তারা মনে করতো, বাইসন দয়া করে তাদের মাংস খেতে দেয়। অবশ্য আমরা এখনো অনেক সময় ঐ রকম কথা বলি। আমরা বলি, গরু দুধ দেয়—কেউ কখনো বলি না, গরুর কাছ থেকে দুধ আদায় করি। কখনো কাউকে বলতে শুনেছ, গরুর দুধ কেড়ে খাই ?

আমাদের মতই আদিম মানুষেরা বাইসন, ম্যামথের মাংস শিকার করে খেত বলেই তাদের উপকারী বলে মনে করতো। তাদের মতে শিকারীরা বাইসন মারতো না—বাইসনেরাই দয়া করে মাংস খেতে দিত। তাদের দৃঢ় ধারণা ছিল, জীবজন্তু দয়া করে ইচ্ছা না করলে তাদের কেউ মারতেই পারে না।

বাইসনের কৃপায় মাংস খেতে পাওয়া যেত। তাই তাকে সমস্ত কুলের রক্ষাকর্ত্তা বলে মনে করা হত। জগত সম্বন্ধে আদিম অধিবাসীদের তখনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না। এই জন্যেই তারা তাদের রক্ষাকর্ত্তা পশু ও নিজেদের পূর্ব্বপুরুষদের ধারণা ও পার্থক্য গুলিয়ে ফেলল। তাদের মনে হল যে, তারা

বাইসন বা ঐ জাতীয় কোন জীব থেকেই জন্মেছে। এই কারণেই সেদিনের চিত্রকর যখন ঘরের দেওয়ালে বাইসনের ছবি আঁকতো তখন সত্যি সত্যি মনে করতো যে তারা সকলে বাইসন থেকে উদ্ভূত।

মানুষের তখনো নানা সূত্রে বুনো জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল।

ঐ সব পশুকে তারা নিজেদের আত্মীয়-কুটুম্ব বলে মনে করতো। কাজেই কোনও পশু শিকার করলে সবাই মিলে তার কাছে তখন ক্ষমা চাইতো, সেই পশুর চামড়া গায়ে দিয়ে তারা ভাবতো—আর তাদের আপদ-বিপদের সম্ভাবনা নেই।

মানুষ তখনো পুরোপুরি "আমি" বলে ভাবতে শেখে নি। যে কুলের লোক সে সেই গোটা কুলেরই একটা ছোট অংশ বা ভগ্নাংশ বলে নিজেকে মনে করতো। আমরা যেমন "আমার, আমার" ছাড়া চলতে পারি না তাদের কিন্তু তেমন একান্ত আপনার বলে কিছু ছিল না। সবই সবার, তাই প্রত্যেকেই "আমরা" বা "আমাদের"। এক-এক কুলের এক-এক বিশেষ পশুর চিহ্ন বা প্রতীক থাকতো (totem)! প্রধানতঃ যে-যে পশু শিকার করে তাদের কুলের জীবনযাত্রা চলতো—সেই সেই পশুই তাদের পূর্ব্বপুরুষদের চিহ্ন হত। হরিণ, বাইসন, ভালুক—এই সব পশু ছিল নানা কুলের প্রতীক! ঐ কুলের আচার-ব্যবহার সবই সেই পশু-চিহ্নের আদেশ বলে তারা শিরোধার্য্য করতো।

পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে গল্প

সেকালের লোকেরা কি ভাবে চলাফেরা করতো, কোন্ ভাষায় কথা বলতো, তাদের আচার ব্যবহার সংস্কার কি ছিল—এ সব জানবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা জানবার উপায় কি? কালের কবলে সবই গেছে লোপ পেয়ে। মাঝে মাঝে আমরা খুঁজে পেয়েছি কোথাও মাথার খুলি, কোথাও বা ভাঙা হাড়ের টুকরো! তা থেকে আর কেমন করে জানা যাবে, সেকালের লোকেরা কি ভাবে কথাবার্ত্তা বলতো?

আমাদের চলতি ভাষা থেকেই খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করতে হবে সেকালের ভাষা। কথাটা শুনে যত সহজ মনে হচ্ছে আসলে কাজটা কিন্তু তত সহজ নয়। অতীতের ভাষা আবিষ্কারের জন্য উৎসাহীদের নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙিয়ে নানা দেশে গিয়ে অনুসন্ধান করতে হয়। অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষা আমরা শিখেছি। কাজেই এখন যেতে হবে সে সব ছেড়ে পলিনেশিয়া (প্রশান্ত মহাসাগরে) দ্বীপপুঞ্জে। তা বাদে দক্ষিণের মরুভূমি ও উত্তরের তুন্দ্রা অঞ্চলেও তাঁরা ভাষা আবিষ্কার করতে যান। খুব উত্তরের চলতি ভাষায় এখনো এমন অনেক শব্দ আছে যা থেকে বোঝা যায় যে, সেগুলো মানুষের একান্ত 'আমার' ধারণা হবার আগের যুগ থেকেই প্রচলিত।

সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমরা ভুল না করি। কারণ বহু যুগের প্রচলনের ভিতর দিয়ে ভাষাও রূপ বদলিয়েছে। এমন কি, অনেক শব্দের আগে যে অর্থ ছিল বর্ত্তমানে হয়তো তা সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গিয়েছে। নতুন ভাষা সৃষ্টির হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে আমরা অনেক সময় পুরনো শব্দে নতুন অর্থ আরোপ করি। আমাদের ভাষা থেকেই দৃষ্টান্ত শুরু করা যাক্। এককালে ভালো ভালো জিনিস সবার আগে রাজার ভোগে লাগতো। বড় বড় ব্যাপার রাজার নামেই হত। এ থেকে 'শ্রেষ্ঠ' অর্থে 'রাজ' শব্দ দাঁড়িয়ে গেছে। তাই এদেশে আজ আর কেউ রাজা নেই কিন্তু 'রাজধানী' আছে। আমাদের কলিকাতা বাঙলার রাজধানী। রাজা পথ চলেন না, তবু 'রাজপথের' অভাব নেই। ভিখিরীও পয়সা দিলে ময়রা তাকে 'রাজভোগ' খেতে দেবে। 'রাজা' কবে উড়ে গেছে কিন্তু শব্দটা অর্থের ভোল ফিরিয়ে নানাভাবে বেঁচে আছে। ইংরেজীতে quill কথাটাই নাও না। আগে পাখীর পালক অর্থে ঐ শব্দটার ব্যবহার ছিল। কিন্তু আগে পালক দিয়ে লেখা হত বলে বর্ত্তমানে কলম বোঝাতে এই শব্দটাও চালু হয়ে গেছে! ইংরেজীতে আজ ক্লার্ককে (কেরানী) কুইল-ড্রাইভার বললে বুঝতে এক মুহূর্ত্ত দেরী হবে না। বাষ্পীয় হাতুড়ি মোটেই হাতুড়ির মত দেখতে নয়! যে খুব ভাল গুলি ছুঁড়তে পারে তাকে রাশিয়ান ভাষায় এখনো তীরন্দাজ বলে। হস্তলিপির ইংরেজী—ম্যানাস্ক্রিপ্ট্।

কিন্তু বর্ত্তমানে টাইপরাইটার আবিষ্কারের পরে খুব কম ইংরেজী হস্তলিপিই হাতে লেখা হয়। তবু তার নাম রয়ে গেছে হস্তলিপি।

এগুলো কতকটা আধুনিক বলে আমরা বের করতে পারলাম। কিন্তু আরো পুরনো ভাষা আবিষ্কার খুব কঠিন। মার্ (Marr) নামে একজন পণ্ডিত এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করেন। তিনি বের করেন যে, এখনো অনেক দেশে ঘোড়া বোঝাতে লোকে বল্গাহরিণ কিংবা কুকুর বলে। কারণ তারা ঘোড়ায় চড়ার আগে বল্গাহরিণ ও কুকুরের পিঠে চড়তো। অনেক ভাষায় বড় কুকুর বললে সিংহ বোঝা যায়। তার কারণ সিংহের আগে কুকুর আবিষ্কার হয়েছিল। মেশচানিনভ্ (Meschaninov) নামে আর একজন ভাষাবিদ্ পুরনো ভাষার এক সঞ্চয়ন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতে উকাগির (Youkagir) জাতির একটি শব্দ আছে। তার শব্দ ধরে মানে করলে দাঁড়াবে "মানুষ-বল্গাহরিণ মারা"! এত বড় কথা উচ্চারণ করাও কঠিন। এ থেকে কে কাকে মেরেছে তাও বোঝা কঠিন। মানুষ মেরেছে বল্গাহরিণ, না বল্গাহরিণ মেরেছে মানুষ? এর মানে কিন্তু উকাগিরদের কাছে সহজ। মানুষ বল্গাহরিণ মেরেছে, এই হচ্ছে এর অর্থ।

শব্দটি এরকম অদ্ভুত হল কেন? কারণ মানুষ তখনো জানতো না যে সে একাই, এমন কি তাদের গোটা বংশ বল্গাহরিণ মেরেছে! কোনও অদৃশ্যই শক্তিই মেরেছে এই ছিল ধারণা।

মানুষ তখনো নিজেকে খুব দুর্ব্বল মনে করতো বলে ভাষায়ও তার ছাপ পড়েছে। কোনও দিন হয়তো তারা অজানা শক্তির সাহায্যে "মানুষ-বল্লাহরিণ মারা" সাফল্যের সঙ্গেই করেছিল; তার পরদিনই হয়তো বরাতের ফেরে তারা খালি হাতে ফিরে এল। কাজেই 'মানুষ-বল্লাহরিণ মারা' শব্দটিতে কোনও স্পষ্ট কর্ত্তৃকারক নেই। থাকবে কি করে! কে যে মারল—মানুষ না হরিণ, তা-ই তো তখনো স্পষ্ট নয়। আগেই বলে এসেছি, মানুষের ধারণা ছিল যে, সেই হরিণ তার কোনও পূর্ব্বপুরুষ দয়া করে পাঠিয়ে দিয়েছেন!

আর একটি শব্দ নাও চুকোটদের (Chukot)। "মানুষ-দিয়ে-মাংস-দেয়-কুকুর"! এর অর্থ আমাদের কাছে অবোধ্য। কিন্তু তারা এর মানে করে, "মানুষ কুকুরকে মাংস দিল।" মানুষ তো নিজে কোনও কিছু করতে পারে না! কাজেই কোনও অদৃশ্য শক্তি মানুষকে দিয়ে কুকুরকে মাংস দেওয়ায়!

ফরাসী ভাষায় আছে ইল ফেৎ ফ্রোয়াদ (il fait froid) মানে "শীত পড়েছে।" কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে, "তিনি শীত করেছেন"—এখানেও সেই "তিনি", মানে যিনি জগত চালান। এখনো ইংরেজীতে বহু শব্দ চলে যার গঠন একটু অদ্ভুত! ইট্ ইজ্ রেনিং (বৃষ্টি পড়ছে)। এখানেও সেই রহস্যময় 'ইট্' (ইহা)। আমরা বলি "ঘড়িটা পাওয়া গিয়েছে"—যেন ঘড়িটা আমরা পাই নি—কোনও মন্ত্রের বলে আশ্চর্য্য ভাবে ঘড়িটা আমাদের হাতে এসে গিয়েছে! আমরা এখন আর কোন

শক্তিতে বিশ্বাস না করলেও ভাষায় ঐ শব্দটি বাঁচিয়ে রেখেছি।

ক্রমে যতই দিন যেতে লাগল, মানুষ ততই শক্তিশালী হল। ফলে ভাষায় "আমিত্বের" বিকাশ দেখা দিল। আর সে বলে না—মানুষ-দিয়ে-এটা-হরিণ-মারল (It killed rein deer by man)। তার জায়গায় বলল, "মানুষ হরিণ মেরেছে।"

আমরা এখনো বলি "দুর্ভাগ্য", "কপালের লেখা"। এসবের মধ্যেও সেই অদৃশ্য জিনিসের প্রভাব। আমাদের ভাষার মত প্রায় সবদেশের ভাষাতেই এসব শব্দ আছে। সোভিয়েট দেশের লোক কিন্তু মনে করে যে, অদূর ভবিষ্যতে তাদের ভাষায় এসব শব্দ অচল হয়ে যাবে। কারণ সেখানে নিরুপায় চাষীকে প্রকৃতির মুখের দিকে তাকিয়ে তার কৃপার আশায় চাষ করতে হয় না! যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ সে দেশে জল দেওয়া, মাটি কাটার কাজ করছে। অজ্ঞানতা থেকে যতসব ভয় জমেছিল আজ জ্ঞানের পরিধি বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সে সব ভয় কেটে গিয়ে শক্তি বাড়ছে।

প্রকৃতির নিয়মকানুন না-জানা পর্য্যন্ত এবং সেসব নিয়ম-কানুন নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে না-শেখা পর্য্যন্ত মানুষ ভয়ে ভয়ে প্রকৃতিদেবীর দাসের মত জীবন কাটিয়েছে। কিন্তু জ্ঞান বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে-ই বরং প্রকৃতিকে শাসন করছে।

বিরাট বসন্ত

বরফের দেশে প্রত্যেক বছর বরফ গলবার সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। যেদিকে তাকাবে সেদিকেই দেখবে, প্রকৃতির রূপ বদলে যাচ্ছে। আগে যেখানটা বরফে ঢেকে ছিল, এখন সূর্য্যের আলোর আঁচ লেগে সেখানে মাঠে মাঠে ঘাস গজাতে শুরু করেছে। গাছের ডালে ডালে আবার নতুন পাতা বেরিয়েছে। বছরে বছরে বরফ গলবার সময় যদি এমনি হয় তা হলে মনে কর বহু-বহু-বহু যুগ-যুগান্তের আগের কথা—সেই বিরাট বরফের অভিযান; সেই বরফ ভাঙার সময় কি অবস্থা হয়েছিল মনে করে দেখ।

প্রকৃতিদেবী তখন যেন গভীর ঘুম থেকে জাগলেন। চার-দিকে বিশাল বিশাল নদী বইতে লাগল সব কিছু ভাসিয়ে দিয়ে। উত্তরাঞ্চলের যে সব পর্ব্বত ও উপত্যকা ভরে এতদিন ছিল শীতের অবাধ রাজত্ব, সেখানে দেখা দিল সুন্দর বসন্তকাল। কিন্তু এ বসন্ত-সমাগম একদিনেই সম্ভব হয় নি। সমস্ত বরফের চাপ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল—যেন তারা যেতে আর চাইছে না! শত শত বৎসর লাগল তাদের সরে যেতে। কিছু দূর গিয়ে হয় তো থেমেও গেছে। আবার নতুন করে শুরু হয়েছে সরে-পড়ার শোভাযাত্রা।

ঐ বরফের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল লম্বা ঘাসের বিশাল মাঠ। আর এল বল্গাহরিণ। বাইসন ও ঘোড়া চরার

মাঠ আরও দক্ষিণে সরে এল। এবার শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা অনেক দিন ধরে চলল। অবশেষে গ্রীষ্ম কালেরই জয় হল। ভূপৃষ্ঠ ক্রমেই গরম হতে লাগল। পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে এ্যাসপেন গাছ মাথা তুলল। উত্তরের এই সব নতুন জঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে এমন সব জন্তুও দেখা দিতে লাগল, যারা এই সব গাছপালার এলাকা ভাল-বাসে। সে সব জঙ্গল ভরে গেল বন্য বরাহে, বুনো ষাঁড়ে, পাটকিলে রঙের ভালুকে। বন-জঙ্গলের বিলে ঝিলে ভেসে বেড়াতে লগাল বুনো হাঁস।

চারদিকের এই সব পরিবর্ত্তনের আমলে মানুষ চুপ করে থাকতে পারে না। ঐ পরিবর্ত্তনে তাকেও অংশ গ্রহণ করতে হয়। প্রত্যেক দৃশ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকেও বাঁচবার জন্য তার জীবনযাত্রার প্রণালী বদলাতে হয়, চারদিকের অদল-বদলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।

তুন্দ্রা অঞ্চল যতই দক্ষিণে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য শৃঙ্খলে বাঁধা বল্গাহরিণ থেকে শুরু করে শ্যাওলা ঘাস ইত্যাদিও সরে এসেছে! মানুষও তাদের পেছনে পেছনে এল। যেদিক বরফে জমে যায় নি, সেদিকে মানুষ বাইসন ও ঘোড়া শিকার করতে লাগল। তুন্দ্রা অঞ্চলে তাকে শিকার করতে হত শুধু বল্গাহরিণ। এর আগের যুগের অধিকাংশ প্রাণীকেই মানুষ মেরে মেরে শেষ করে এনেছিল, তখন শুধু অবশিষ্ট ছিল ঐ বল্গাহরিণ! কাজেই বল্গাহরিণের পেছনে পেছনে তাকেও

চলাফেরা করতে হচ্ছিল। কোথাও স্থির হয়ে মানুষ থাকতে পারল না।

এবার একদল শিকারী মেরু প্রদেশে চলে এল। কারণ, তারা এতদিন ধরে ঐ ধরনের আবহাওয়াতে থাকতে অভ্যস্ত ছিল। শীতের রাজত্ব চলেছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বছর ধরে। সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে চামড়ার জামা-কাপড় তৈরী করে সারা শরীর গরম রাখতে মানুষ শিখেছিল।

এভাবে উত্তরে চলে যাওয়া সহজ হলেও সব সময় ফল ভাল হত না। যারা উত্তরে গেল, শেষ পর্য্যন্ত তাদের ঠকতে হল। তাদের মধ্যে সেই বরফ যুগের জীবনের স্থায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। সেজন্য দেখবে যে, গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমোরা আদিম প্রকৃতির সঙ্গে রাত্রিদিন সংগ্রাম করে দিন কাটাচ্ছে। তার মানে, মানুষের ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে তারা বেশি দূর উঠতে পারে না।

যারা আগের জায়গাতেই রয়ে গেল, তাদের অবশ্য গোড়াতে কষ্ট করতে হল খুবই কিন্তু একটা দিকে তাদের ভালই হল। পিতৃপিতামহের মত বরফের খাঁচায় তারা আর বন্দী হয়ে রইল না।

আগের সমভূমিতে এখন ভীষণ জঙ্গল দেখা দিল, সেই গহন জঙ্গলে ঢোকে কার সাধ্য! মানুষকে তখন সব সময় গাছ কেটে জঙ্গলের সঙ্গে সংগ্রাম করে বাঁচতে হত। গাছ কাটবার জন্যে এখন থেকে নতুন অস্ত্র দরকার হল।

বর্শার বদলে তাই এল তীর-ধনুক

তাই মানুষ আগের সেই পাথরের মত অস্ত্রকে কাঠের সঙ্গে বেঁধে কুড়ুল তৈরী করে নিল।

জঙ্গল একটু পরিষ্কার করেই মানুষ সেখানে চারদিকে কাঠের খুঁটি পুঁতে তৈরি করে নিল ঘর। এতদিনে তো জঙ্গলে বসবাস করা ছিল কঠিন। এবার আরও কঠিন সমস্যা দেখা দিল। তা হচ্ছে খাবার! আগে মানুষের শিকার দূর থেকে দেখা যেত। কিন্তু এখানে তারা বড় একটা চোখে পড়ে না, শুধু আওয়াজ শোনা যায়। যদি কাউকে দেখা গেল—তো চোখের নিমিষে তাকে না মারলে তখুনি সে পালিয়ে যাবে। প্রয়োজনের টানে বর্শার বদলে তাই এল তীর-ধনুক! তীর-ভরতি তূণ কাঁধে নিয়ে শিকারী শিকার করতে বার হল। তার সাথী হল এক চতুষ্পদ জীব—কুকুর।

হাজার হাজার বছর ধরে কুকুর মানুষের বন্ধুর কাজ করে এসেছে। যেখানে মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেছে তার কাছেই কুকুরেরও হদিশ পাওয়া গেছে। বিনা কারণে নিশ্চয় মানুষ কুকুর পোষে নি। মানুষ টের পাবার আগেই কুকুর আঁচ করে নেয় শিকার কোন্ দিকে রয়েছে। মানুষ তখন নিশ্চিন্তে তাকে অনুসরণ করে শিকার দেখতে পায়। এককথায়, কুকুর পুষে মানুষের শক্তি আরও বেড়ে গেল! কুকুর যেমন শিকারেও সাহায্য করে তেমনি শ্লেজগাড়ি করে বরফের উপর দিয়ে মানুষকে টেনে নিয়েও বেড়ায়!

জঙ্গলেও আবার সকলে গেল না। একদল জঙ্গল ছেড়ে নদী ও হ্রদের তীরে চলে গেল। সেখানে জঙ্গল আর নদীর মধ্যের সরু জমিতে তারা বসতি শুরু করে। জঙ্গলে থাকা যেমন কঠিন, সে তুলনায় এখানেও মানুষকে কম ব্যতিব্যস্ত হতে হল না! হঠাৎ নদী ফেঁপে উঠে তাদের ঘরবাড়ী ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মানুষ তখন গাছে উঠে আত্মরক্ষা করে। প্রথম প্রথম বন্যা এসে মানুষকে আচমকা আক্রমণ করতো! কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষ নদীর কারসাজি বুঝ্‌তে শিখল। সে কাঠ কেটে উঁচু মাচানের মত করে তার উপর বাসা বাঁধল। এখন আর মানুষের বন্যার ভয় রইল না।

মানুষের পক্ষে এ এক মস্ত বড় জয়! নদীর নীচু পার উঁচু করতে পারা সহজ কথা নয়। কিন্তু একদিন ঐ শক্ত কাজ সহজ হতে পেরেছিল বলেই আজকের যত বড় বড় বাঁধ দেখ্‌ছ!

নদীর সঙ্গে এভাবে মানুষকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। মানুষ কেন সাধ করে ঐ সংগ্রাম করতে গেল? জেলেদের এ কথা জিজ্ঞেস করলে জবাব পাবে। মাছের আকর্ষণেই তারা নদীতে নামে!

কিন্তু শিকারী কেমন করে জেলে হল? শিকারের অস্ত্র দিয়ে তো মাছ মারা যাবে না। মাছ ধরবার কায়দা-কানুনও আলাদা। রাতারাতি শিকারী নিশ্চয়ই জেলে হয়ে যায় নি। জাল দিয়ে মাছ ধরা শেখবার আগে ডাঙার শিকারের মত করে সে মাছ শিকার শেখে। হাঁটু জলে বর্শা ছুঁড়ে সে মাছ

মারতে শুরু করে। সেই সময় গাছে পাখী ধরবার জন্য জাল বোনার বিদ্যা সে কাজে লাগায়। নদীতেও সে জাল ফেলতে লাগল। ক্রমে ক্রমে মানুষ বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরা শিখল।

বছর ষাটেক আগে রুশিয়ার ল্যাডোগা হ্রদের তীরে জন কয়েক শ্রমিক মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটা মানুষের মাথার খুলি ও কয়েকটা পাথরের যন্ত্রপাতি পায়। সেই খবর প্রত্নতাত্ত্বিকদের কানে পৌঁছে গেল। তাঁরা এসে সেখান থেকে আবিষ্কার করলেন পাথরের কুড়ুল, পাথরের ছুরি, মাছের বঁড়শি, তীরের ডগা, করাতের মত দাঁতের হারপুন (তিমি মারা বর্শা), আর একটি কবচ। এগুলো পাওয়ার পর আরও মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল সেকালের এক ডিঙি নৌকা। তখন তাঁদের আনন্দ দেখে কে! লম্বা ওক গাছের গুঁড়ি কেটে সে ডিঙি তৈরী করা হয়েছিল। পাথরের কুড়ুলে অত শক্তকাঠ সব সময় কাটা সম্ভব নয় বলে মাঝে মাঝে গাছের গুঁড়ি আগুনে পুড়িয়ে কাজের উপযোগী করে নিতে হয়েছে। যে কুড়ুল দিয়ে ডিঙিটা বানানো হয়েছিল সেই কুড়ুলটাই পড়ে ছিল সেখানে। তার ধারগুলো বেশ পালিশ করা! বোঝা গেল, একদিন মানুষ অনেক কষ্টে ডিঙি তৈরী করে, তাকে টেনে হ্রদে নেমে পড়েছিল। সঙ্গে নিয়েছিল মাছ মারবার সাজ-সরঞ্জাম। যে ওক গাছ ঝড়েও ভাঙতে পারে না—মানুষ তাকে অনায়াসে কেটে নদীর উপর দিয়ে ভাসিয়ে নিতে পেরেছিল!

ভাবতে গেলে অবাক্ লাগে। এমন দিনও ছিল যখন মানুষ নিজের সীমানার একটুও বাইরে যেতে পারত না। তার এলাকার বাইরে সব জায়গায় যেন টাঙানো থাকত "প্রবেশ নিষেধ!" মানুষ তার নিজের শক্তিতে সে বাধা ডিঙিয়েছে। জলও আর মানুষের কাছে অগম্য রইল না!

মানুষ কারিকর

আজ আমাদের আসেপাশে কত কারিকর আছে, তারা অক্লেশে কত নতুন নতুন জিনিস বানাচ্ছে। একটি যন্ত্র দিয়ে না পারলে সে ক্ষেত্রে হাজারটি যন্ত্রের সাহায্য নিচ্ছে। কিন্তু ঐ হাজারের সুযোগ-সুবিধার মূলে রয়েছে পূর্ব্বপুরুষদের সেই সব ছোট ছোট নগণ্য যন্ত্রপাতির আবিষ্কার আর তাদের ব্যবহার।

সেকালের প্রথম কুমোরের কথা ধর। প্রকৃতির রাজ্যে যার অস্তিত্ব ছিল না, মাটি দিয়ে এমন নতুন জিনিসই সে গড়ে তুলল। এর ভিতরে রয়েছে দুটো দিকে মানুষের জয়ের ইতিহাস—মাটি ও আগুন দুইয়ের উপরই মানুষের কর্ত্তৃত্ব!

আগে মানুষ আগুন ব্যবহার করেছে সত্যি। আগুন দিয়ে তারা শরীর গরম করত, হিংস্র জানোয়ার তাড়াত, জঙ্গল পরিষ্কার করত। ডিঙি তৈরীর কাজে আগুন কুড়ুলের সাহায্য করত। কাঠে কাঠে ঘষলেই আলাদীনের দৈত্যের

মত অনায়াসে আগুন জ্বলে ওঠে! মানুষ তা আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু তারপরে মানুষ আগুনের সাহায্যে এক জিনিসকে আর এক জিনিসে রূপান্তরিত করতে শিখল। পূর্ব্বপুরুষদের ঐ নতুন আবিষ্কার ও অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফলেই কলকারখানা আর বাড়ীতে বাড়ীতে আগুন জ্বেলে আজ কত কাজ হচ্ছে।

শস্যবীজের ইতিকথা

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা একটা জায়গা খুঁড়তে খুঁড়তে অন্য সব জিনিসের সঙ্গে কয়েকটি হাঁড়ি দেখতে পান। সেগুলোর গায় হিজিবিজি দাগ কাটা! এর থেকে বোঝা যায়, সে কালের কুমারেরা কি করে মাটির বাসন তৈরী করত। আগে বাঁশের কি কাঠের কাঠামো তৈরী করে তার উপর মাটি লেপে বসিয়ে দেওয়া হত। পরে আগুনে পোড়ালে সে বাসনের বাঁশ বা কাঠ পুড়ে যেত আর থাকত শুধু মাটি—ঐ মাটির বাসনের গায়ে তখন ঐ সব হিজিবিজি দাগ কেটে যেত!

মানুষের বংশধরেরা এর পরে অন্য ভাবে বাসন তৈরী করতে শিখলেও সে সবের গায়েও নানা হিজিবিজি দাগ কাটত। তাদের ধারণা ছিল, দাগ না কাটলে সে বাসনে কখনো কাজ ভাল হবে না। অনেক হাঁড়ি পাওয়া গেছে যার গায়ে কুকুরের ছবিও আঁকা আছে। ফ্রান্সের কঁপিঞেঁ (compigne)

শহরে এ রকম একটি হাঁড়ির গায়ে দেখা যায় নানা শস্যবীজের ছবি। এ আবিষ্কারে প্রত্নতাত্ত্বিক মহল উল্লসিত হয়ে উঠলেন। শস্যবীজের ছবি যখন আঁকা রয়েছে তখন নিশ্চয় মানুষ ততদিনে চাষ-বাসও শিখেছে! সেইখানে তাঁরা যাঁতা আর পাথরের নিড়ানিও খুঁজে পেলেন! তখনকার শিকারী ও জেলেরা তা হলে চাষবাসও শিখে ফেলেছিল!

কুলের প্রত্যেক লোকই যে শিকার করত বা মাছ ধরত তা যেন মনে না করি। পুরুষেরা শিকারে বেরিয়ে গেলে মেয়েরা আর ছোট ছেলেমেয়েরা ঝাকা নিয়ে বার হয়ে পড়ত জিনিস কুড়িয়ে আনতে। যা-কিছু চোখে পড়ত তা-ই তারা কুড়িয়ে আনত। জঙ্গল থেকে ফলমূল, সমুদ্রের পার থেকে ঝিনুক—কিছুই তারা বাদ দিত না!

এরকম ভাবে ঘুরতে ঘুরতে তারা মৌমাছির চাক আবিষ্কার করে। তখন তাদের কি আনন্দ! পাহাড়ের গায়ে আঁকা রয়েছে একটি মেয়ের মূর্তি। সে গাছে উঠে এক হাতে হাঁড়ি ধরে অন্য হাতে তার মধ্যে মৌচাক থেকে মধু ঢালছে! চারদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি, অথচ তার ভ্রূক্ষেপ নেই! সেই মধু এনেই তারা খেয়ে উড়িয়ে দিত না। মানুষ তত দিনে সঞ্চয়ের উপকারিতা বুঝেছে। সে ঐ মধু দুর্দিনের জন্য সঞ্চিত করে রাখতে শিখেছে।

মেয়েরা বাইরে থেকে অনেক কিছু যোগাড় করে আনত। সেই সঙ্গে কুড়িয়ে-আনা বীজ কখনো অজান্তে মাটিতে ঝরে

পড়ে গেল। কালক্রমে তার থেকে অঙ্কুর গজিয়ে উঠল। সেই অঙ্কুর থেকে শীষ দেখা দেয়, ফুল ফোটে, ফল ধরে। দেখে শুনে তারা শিখল মাটিতে বীজ বুনে দিলে তা থেকে ফসল ফলতে পারে। তখনই প্রথম আবিষ্কৃত হল কৃষি কাজ। হঠাৎ-ই এর উৎপত্তি। বীজ বুনে তার থেকে গাছ হওয়ায় সেকালের লোকের মধ্যে নানা কাহিনী সৃষ্টি হয়েছিল। স্বপ্ন-রাজ্যের এক সুন্দর তরুণ-তরুণীকে কেন্দ্র করে সে সব কাহিনী রচিত হয়। তারা পাতালের যমপুরীতে চলে গিয়ে আবার সেখান থেকে আশ্চর্য্য ভাবে বেরিয়ে এসে পৃথিবীতে ফিরে বাঁচল! পাতালপুরে চলে যাওয়াটা হল দুঃখের আবার বেরিয়ে আসাটা আনন্দের। আমাদের দেশেও এমন নানান উপকথা রয়েছে। বীজ বপনের সময় সেই প্রাচীনকালের মেয়েরা মনে করত যে, সত্যি কোনও দেবতাকেই তারা মাটিতে পুঁতে রাখছে। আবার হেমন্তে সেই শস্য কেটে আনবার সময় তাদের মনে হত—সেই শক্তিকে যেন কেউ মুক্তি দিয়েছে। কাজেই তারা তখন সেই সব শস্যকে ঘিরে নাচগান উৎসব শুরু করে দিত। মেয়েরা ফসলের সুখ্যাতি করত আর মাতা বসুন্ধরার কাছে বর চাইত, তাদের উপর সব সময় কৃপা দৃষ্টি রাখবার প্রার্থনা জানাত।

নতুনের মাঝে পুরাতন

এ শতাব্দীর প্রথমেও অনেক জায়গায় ফসল কাটার সময় সকলে মিলে নাচগান করে 'ফসল কাটার' উৎসব করত! ধানের শীষ নিয়ে তাতে কাপড় জড়িয়ে তাকে ঘিরে গ্রামের সব মেয়ে-পুরুষ নাচত আর গান করত।

ফসল কাটার উৎসব প্রথম চাষের যুগ থেকেই নেমে এসেছে। তখন এ সবের মূলে ছিল নানা অদৃশ্য শক্তিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বন্দনাচ্ছলে উৎসব! আজ আমরা সে যাদু-বিদ্যার দিকটা ভুলে গিয়ে আনন্দের দিকটাকে গ্রহণ করেছি। আমাদের দেশের হিন্দুদের মধ্যে নবান্ন প্রথাও এই রকমই।

মানুষ তখনো প্রাকৃতিক নিয়ম জানত না। শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, তারপর হেমন্ত যে আসবে তা তারা জানত না। প্রত্যেক বারের বসন্ত বা শীত দেখে তারা অবাক হয়ে যেত। শীত বেশী কষ্টকর বলে সবাই চাইত শীত যেন আর না হয়। আবার বসন্ত ভাল বলে সবাই উৎসব করে দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে চাইত, যেন চিরবসন্ত বিরাজ করে পৃথিবীতে! চাষীরা চাইত যেন বর্ষার শেষ না হয়! এই কুসংস্কারই আমরা জীইয়ে রাখছি নানা আমোদ-উৎসবের ভিতর দিয়ে।

আর এক রকম ভাবেও আমরা এসব বাঁচিয়ে রাখছি। উৎসবের হুল্লোড়ে সাধারণ ভাবে যা আমরা করি ও বলি, তাই-ই

পুরোহিত বা পাদ্রীরা ধর্ম্মের আবরণে করেন ও বলেন। তাঁরাও দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নানা মন্ত্র পড়েন। সে সব মন্ত্রের মানে করলে উৎসবাদির গানের আবেদন-নিবেদনেই এসে দাঁড়াবে! অর্থাৎ এখন বাইরে যে ব্যাপার শুধু আমাদের মধ্যে রয়েছে, ধর্ম্ম সেই কুসংস্কারকে বাঁচিয়ে রেখেছে নানা ভড়ংএর মধ্যে!

মেয়েরা একদিকে মাটি খুঁড়ে চাষের উদ্যোগ আয়োজন করত, আর একদিকে তেমনি পুরুষেরা দিনের শেষে ঘরে আসত শিকার-সম্ভার নিয়ে। সেই শিকারের ভেতর অনেক সময় জীবন্ত জন্তুও তারা ধরে আনত। জীবন্ত পশু ধরতে পারলেই এদের আনন্দ বেশী হত! কারণ তাদের আটকে রেখে খাইয়ে দাইয়ে পুষে রাখলে পর দুর্দ্দিনের খাবারের যোগাড় হয়ে থাকত। কোন দিন যদি খাবার না জোটে তখন ঘরের ঐ পশু মেরে খাওয়া হত। সব চেয়ে মজার কথা হল এই যে, এদের বাঁচিয়ে রাখা মানে ভবিষ্যতে আরও বেশী মাংসের আশা রাখা! প্রথম প্রথম লোক মাংসের জন্যেই এদের পালত। তাই আজ হোক কাল হোক দুদিন আগে কি দুদিন পরে মানুষ পালিত পশু কেটে খেত। কিন্তু বাঁচিয়ে রাখলে যে আরো বেশী উপকারে লাগে সে কথা তখনো মানুষের কাছে ধরা পড়ে নি। একটা গরু মেরে সকলে মিলে একবার শুধু খাওয়া যায়। গরুর দুধ কতবার খাওয়া যায়? যতকাল সেই গরু দুধ দেয়। ভেড়ার ক্ষেত্রেও তাই!

লালন-পালন করলে সেই ভেড়ার বংশবৃদ্ধিতে মানুষেরই যে সুবিধে।

এখন থেকে শুরু হল আর এক জীবন-যাত্রা—শিকারীর জীবন ছেড়ে রাখালের জীবন। এবার মানুষের প্রয়োজন হল গরু-ভেড়া চরাবার মত জমি। জঙ্গল কেটে ক্ষেত খামার বানাতে হয়। হাজার রকম বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তবেই মানুষ বিজয়ী হল। চাষের মধ্যে যেমন আনন্দ ছিল তেমনি দুঃখও কিছু কম ছিল না। বেশী রোদ্দুরে চারা গাছ পুড়ে যেতে পারে, অতি-বৃষ্টিতে শস্য বীজ ধুয়ে ভেসে যেতে পারে।

আরও আদিম মানুষ মাংসের জন্যে বাইসনের আরাধনা করত (যদিও তারাই আবার বাইসন শিকার করত), আর আদিম চাষীকুল পৃথিবীর, সূর্য্যের, বরুণের পূজা আরম্ভ করল। বলা বাহুল্য ভাল শস্য পাবার জন্যেই এই সব অনুষ্ঠান। এঁরাই আলো দেন, বৃষ্টি আনেন, বিদ্যুৎ চমকান। এঁদের নিয়ে মানুষ নতুন নতুন দেবতা তৈরী করল। এসব দেবতা মানুষের মতই রূপ নিয়ে থাকতেন এবং তাঁদের নানান নাম দেওয়া হল—সূর্য্য, বরুণ, ইন্দ্র। দৈত্যের আকার নিলেও মানুষ এখনো নিজের শক্তি সম্বন্ধে তেমন সজাগ নয়। আগের মত এখনো সে মনে করে যে দেবতা তাদের খাওয়াচ্ছেন। সে নিজের শক্তিতে কিছুই করতে পারত না, এই ছিল তার ধারণা।

তিন হাজার বছর পর

মনে কর, আমরা এর মধ্যে তিন হাজার বছর কাটিয়ে এসেছি ! চল্লিশ শতাব্দী আগের কথা বলছি ! তাই বলে অবাক হয়ো না। আমরা কোনও বিশেষ যুগের বিশেষ মানুষের কথা বলছি না। গোটা মানুষের সমাজ হচ্ছে আমাদের আলোচ্য বিষয়। সেই মানুষের বয়স অন্ততঃ দশ লক্ষ বছর। তার কাছে চল্লিশ শতাব্দী বেশী কিছু নয় !

এর ভেতর জগতের আরও পরিবর্ত্তন হয়েছে। যেখানে গহন জঙ্গল ছিল শুধু, সে জঙ্গল এখন অনেক সাফ হয়েছে। মাঝে মাঝেই ছুই বিরাট জঙ্গলের মধ্যে খোলা মাঠ দেখা যায় ! নদী ও হ্রদের তীর ক্রমশঃই বেশী চওড়া হচ্ছে ! আর নদীর বাঁকের পাহাড়ের গায় হল্‌দে রুমালের মত ও কি ? মানুষের হাতে চষা এক ফালি জমি। ক্ষেতের মাঝে মাঝে দেখা যাবে, মেয়েরা ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে ! বহু আগেই আমরা হাতুড়ির পরিচয় পেয়েছি। এবার পাচ্ছি কাস্তের ! এখনকার কাস্তের সঙ্গে অবশ্য এর আকাশ-পাতাল তফাৎ। সে কাস্তে হচ্ছে পাথরের তৈরী ! মানুষ এখনো আগাছা নিড়ানোর ফন্দী বার করতে শেখে নি, তাই ক্ষেত অগাছায় ভরতি হয়ে থাকে ! দূরে সবুজ মাঠের মধ্যে চরে বেড়ায় সাদা, লাল, হল্‌দে নানা রং-এর গরু-ভেড়ার পাল।

ক্ষেত ও পশু পাল !···নিশ্চয়ই তা হলে কাছেই মানুষের আস্তানা আছে। সত্যিই আছে। নদীর পারে উঁচু জায়গায় মানুষের ঘরবাড়ী আছে! এতদিনে আমরা সত্যিকার কাঠের বাড়ীর সন্ধান পেলাম। দেওয়ালে মাটি লেপা! দরজার সামনে ষাঁড়ের প্রতীক আঁকা। সে যেন বাড়ীর রক্ষাকর্ত্তা! সেই বসতি ঘিরে উঁচু বেড়া আর নোংরা বাঁধ! গন্ধ উঠ্ছে চারদিক থেকে—ধোঁয়ার আর কাঁচা দুধের! শিশুরা বসতির চারদিকে খেলা করছে, শূয়োরের পাল কাদা খুঁড়ছে; বুড়ীরা উনুনে রুটি সেঁকছে। গরম ছাই-এর ভিতর সেই রুটি ফেলে দিয়ে তার উপর মাটির বাসন চাপা দিয়েছে। কাছেই তাকের উপর রান্নার সব সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত রয়েছে।

সেই নদী ধরে এগিয়ে তার উৎপত্তি স্থান হ্রদের দিকে গেলে আর একটি বসতি নজরে পড়বে। এখানকার লোকেরা নদীর ভেতরেই মাচা বেঁধে থাকে; মাছই তাদের প্রধান জীবিকা। তবে শুধু মাছের উপরেই তারা নির্ভর করে থাকে না।

এতদিন আগের ইতিহাস আমরা জানতে পারলাম কি করে? নদী ও হ্রদ মাঝে মাঝে সরে যায়। পেছনে রেখে যায় এ সবের প্রমাণ!

১৮৫৩ সালে সুইজারল্যাণ্ডে ভীষণ অনাবৃষ্টি হয়। প্রায় সব হ্রদেরই জল শুকিয়ে কাদা বেরিয়ে পড়ে। ৎস্যুরিখ হ্রদের পাশের ওবেরমাইলেন শহরের লোকরা এই সুযোগে
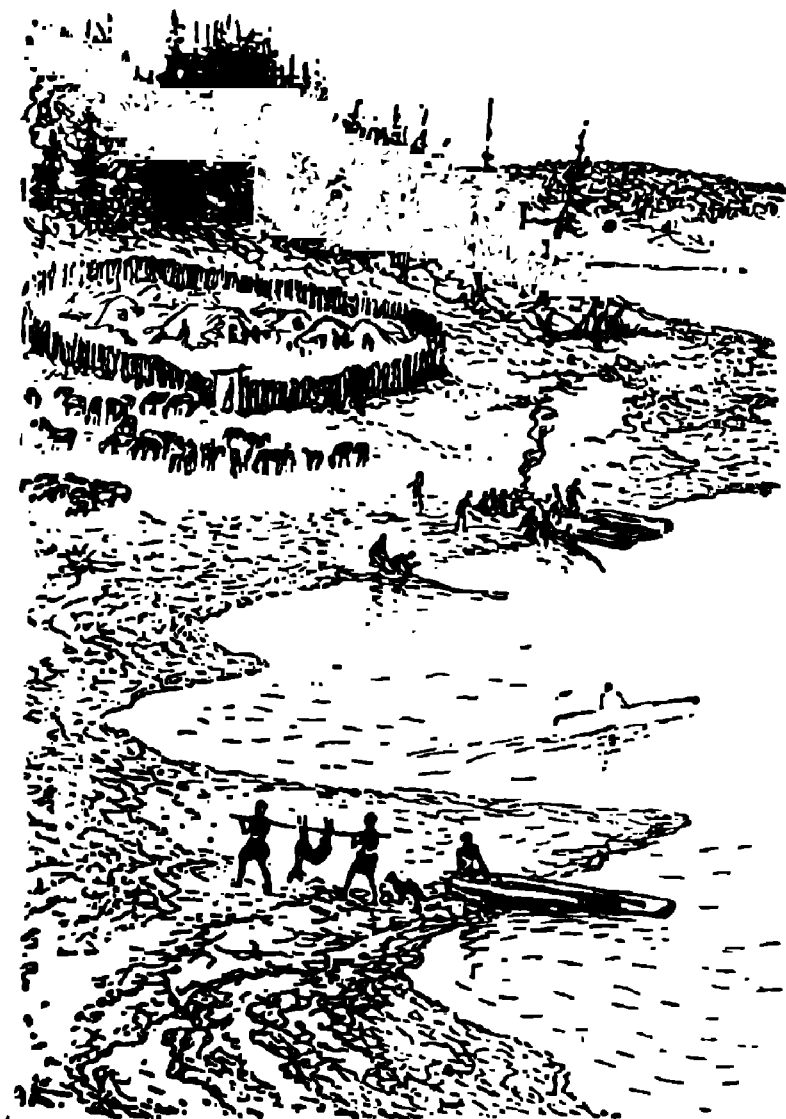
নদীর পারে উঁচু জায়গায় মানুষের ঘর-বাড়ী আছে

কিছু জমি পুনরুদ্ধার করতে চায়! দলে দলে লোক তখন মাটি খুঁড়তে শুরু করে। কিন্তু কিছু দূর কাজ করবার পর তাদের কোদাল আধপচা একটা স্তূপের গায় আটকে যায়। ক্রমে একের পর একটি করে বহু স্তূপ বার হতে থাকে আর বেরুল অগণ্য যন্ত্রপাতি।

আবার প্রত্নতাত্ত্বিকের ডাক পড়ল। দেখতে দেখতে সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হল। আমরা জানতে পারলাম যে, মানুষ সেখানে একদিন ঐ ভাবেই বসবাস করত। তারই ধ্বংসাবশেষ ওগুলো!

সেই ধ্বংস স্তূপের ভিতর অনেক জায়গায় পোড়া কাঠ পাওয়া গিয়েছিল। কেন? এর উত্তরও সহজ! জলপ্লাবনে কত কিছু ধসে ভেসে যায় বলেই মানুষ জলকে ভয় করত। কাঠের ঘরবাড়ী হওয়ার পরে তেমনই আগুনের ভয় বাড়ল। কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে আগুন লেগে গোটা বস্তি পুড়ে খাক হয়ে গেল। সমস্ত ঘরদোর হয় তো পুড়ে জলে ভেঙেই পড়ল। জলে পড়বার সঙ্গেই আগুন গেল নিবে। পোড়া কয়লায় ঢাকা ছিল বলেই সেই সব কাঠের জিনিসপত্র পচতে পারে নি। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রায় সব যেমনকার জিনিস তেমনিই পান।
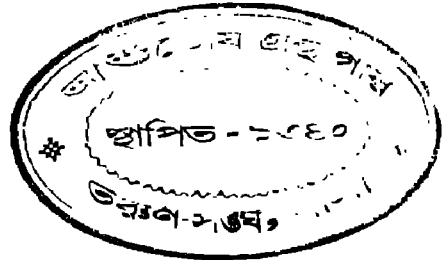
তাঁতের সূত্রপাত

প্রথম বোনা কাপড় কিন্তু তাঁতের নয়—হাতের। এখনও এস্কিমোরা হাতেই কাপড় তৈরী করে। লম্বা ফ্রেমের ভিতর তারা সূতা টেনে দিয়ে তার উপরে নীচে ছোট সূতোর প'ড়েন দিয়ে কাপড় বোনে। হ্রদের নীচে অবিষ্কৃত হয়েছিল আধ-পোড়া ন্যাকড়া। তার থেকেই আমরা জানতে পারি যে, তখনকার মানুষ জন্তুজানোয়ারের ছাল দিয়ে আর গা ঢাকত না, সে কাপড় বুনতে শিখে গেছে।

শনের গাছ বড় হলে মেয়েদের আবার খাটুনি বাড়ত! সেই শন গাছ কেটে জলে থেৎলিয়ে তার থেকে সূতো বের করে কাপড় বুনে তবে তাদের নিস্তার! খাটুনি যেমন ছিল তেমনই কাপড় বোনা সাঙ্গ হয়ে গেলে তাদের কত আনন্দই না হত!

প্রথম খনিকর ও ধাতুকর

এখন ঘরে ঘরে এমন অনেক জিনিসপত্তর রয়েছে যা ঠিক ঐ অবস্থাতেই প্রকৃতির রাজ্যে পাওয়া যায় না। কাগজ, ইঁট, চীনামাটির বাসন—কোন্‌টা আপনা থেকে পাওয়া যায়? প্রাকৃতিক অবস্থায় যে সব জিনিস পাওয়া যায়—তাই নিয়ে এমন ভাবে তার রূপ মানুষ বদলে দেয় যে, তখন আর তাকে চেনা যায় না! চক্‌চকে চীনামাটির বাসন দেখে কে তাকে কাদা বলে বুঝতে পারবে?

কিন্তু যে মানুষ যুগ যুগ ধরে পাথর দিয়ে কাজ করছে—সে হটাৎ কোন্ ধাতু দিয়ে অস্ত্র তৈরী করতে লাগল? আমাদের চোখে পথে ঘাটে আজ অজস্র তামার টুক্‌রোও পড়ে না যে বলব ঃ তামা এত বেশী ছিল বলেই মানুষ তাই থেকে এত সব তৈরী করেছিল। এখন নজরে না পড়লেও তামা এককালে যে খুব বেশী ছিল একথা সত্যি।

ক্রমে ক্রমে বেশী বেশী ব্যবহারের ফলে পাথর কমে গেল। তখন মাটি খুঁড়ে পাথর বের করতে হয়! চক ও পাথর প্রায়ই পশাপাশি থাকে। সেই সময় তিরিশ থেকে ষাট ফিট গভীর এক একটি খনি থেকে মানুষ প্রয়োজন মত পাথর যোগাড় করত। তাতেও অনেক হাঙ্গামা ছিল। দড়ি বেয়ে নীচে নামতে হ'ত। খানিক ভিতরে ছিল অন্ধকার। খাদ যে কখন ধসে পড়ে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

কাজেই আকুল হয়ে মানুষ ভাবতে লাগল যে, পাথরের অভাব কি করে মেটান যায়। সেই সময় তাদের নজরে পড়ে—আসেপাশে সবুজ রং-এর কি যেন ছড়িয়ে রয়েছে! এই সব সবুজ তাল হচ্ছে তামার। একটা বড় তামার তাল কুড়িয়ে মানুষ হাতুড়ী পিটিয়ে তাকে লম্বা করতে লাগল। যতই পিটোতে থাকে, তামাও ততই শক্ত ও চ্যাপ্টা হয়ে যায়। হয়তো সেই সময় আগুনের সাহায্যে ঐ তামা গলাবারও চেষ্টা হয়। আগুনে গলে সবুজ তামার তালের জায়গায় পাওয়া গেল সুন্দর লাল ধাতু! অবাক হয়ে মানুষ সবুজ

তামার তালের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করতে লাগল—আর ভাবতে থাকে, হয়তো এটা আগুনের ভূত-টুত কিছু হবে! আগুনের দেবতা ঐ সব তৈরী করে বলে মানুষের অদ্ভুত ধারণা ছিল। তারপরে সেই তামার টুক্‌রো থেকে তারা নতুন অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি সব বানাতে লাগল!—এর সবটা কৃতিত্বই কিন্তু মানুষের প্রাপ্য!

শ্রমপঞ্জী

মানুষের ইতিহাসে বিভিন্ন স্তরের নাম দেওয়া আছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। "পুরানো প্রস্তর যুগ," "নতুন প্রস্তর যুগ", "তাম্রযুগ", "কাঁসা-পিতলের যুগ" ইত্যাদি। এগুলো বর্ষপঞ্জী নয়—শ্রমপঞ্জী। এর থেকে আমরা জানতে পারি যে, মানুষ কখন উন্নতির কোন্ স্তরে ছিল।

সব জায়গায় মানুষের উন্নতির মাত্রা সমান নয় বলে বিভিন্ন যুগে কোন কোন দেশে তার অনেক আগের যুগের প্রভাবও বিদ্যমান থাকে। বর্ত্তমান কালেও অষ্ট্রেলিয়ার নানা জায়গায় প্রস্তরযুগের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশের লোক আর এক দেশের লোকের সঙ্গে জিনিসপত্তর বিনিময় করত। জিনিসপত্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তারা অভিজ্ঞতাও বিনিময় করত। এরা যা জানত না—তা ওদের কাছ থেকে জেনে নিত কিংবা এরা যা শিখে অভিজ্ঞ হয়েছে ওদের তা শিখিয়ে যেত—অর্থাৎ বিনিময় বাজারে

এসে পরস্পরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার লেনদেন শুরু হয়ে গেল। বিনিময় করতে এসে তাদের মনের ভাব প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল ও ধীরে ধীরে নানা ভাষার সংমিশ্রণ হতে থাকল! নিজেদের দেবদেবীর সঙ্গে বিদেশী দেবদেবীরও পূজার্চ্চনা শুরু হল।

পুরাকালের নানা জাতির ইতিহাস আলোচনা করলে এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। ব্যাবিলোনীয়দের তামুজ (Tamuz) মিশরের ওসিরিস (Osiris) ও গ্রীসের এ্যাডোনিস বিভিন্ন নামে একই কৃষ্টির দেবতা! মানচিত্র দেখলে আমরা বের করে দিতে পারি দেবদেবীরা কি ভাবে এক দেশে থেকে অন্য দেশে আসতেন! ইহুদীদের দেশ সিরিয়া থেকে এ্যাডোনিস গ্রীসে যান। এ্যাডোনিস নামটাই তার প্রমাণ। ইহুদী ভাষায় এ্যাডোনিস নামের অর্থ "মশায়"। গ্রীকরা সেই অর্থ না বুঝে শব্দটাকে এক বিশেষ দেবতার নামে চালিয়ে দেয়। এই ভাবে জিনিসপত্তর, ভাষা ও ধর্ম্মের আদানপ্রদান হতে থাকে!

সব সময় এই আদান-প্রদান নির্ব্বিবাদে হত না। আগন্তুকের দল জোর করে জিনিসপত্তর আদায় করতে পারলে তার বিনিময়ে কিছু দিতে চাইত না! ব্যবসা চিরকালই ধাপ্পাবাজী কিন্তু তখন সেটা খোলাখুলি লুঠতরাজের ব্যাপার ছিল। কাজেই তখনকার সমস্ত গ্রামগুলোকে দুর্গের মত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হত।

অপরিচিত লোককে সবাই সন্দেহ করত। তাকে মারা কিংবা তার সম্পত্তি লুঠ করা পাপ বলে গণ্য হত না। সব কুলেই শুধু নিজেদের লোককে মানুষ বলত—আর কাউকে তারা মানুষ বলতে ঘৃণা বোধ করত! নিজেদের বেলায় তারা কুলের নাম দিত—"সূর্য্যবংশ" "চন্দ্রবংশ"—অন্যের সময় নাম দিত নানা কুৎসিত ধরনের! আমেরিকায় দুটো কুলের অমনি অদ্ভুত নাম পাওয়া যায়—"ধূলো-নাকী" (Dusty Nose) আর "শয়তান" (Crooked Folk)। সেকালের বর্ণ বিদ্বেষ আজও যে মুছে গেছে তা নয়। আজকে জগত এত এগিয়ে গেলেও মানুষ মানুষকে এখনো হিংসা করে। এখনো বহু জাত মনে করে যে জগতে তারাই সবার চেয়ে উঁচু—অন্যেরা অসভ্য কিংবা কম সভ্য। আজও আমাদের দেশের বর্ণ-হিন্দুরা নিজেদের উঁচু মনে করে অনুন্নত জাতি ও উপজাতিদের ঘৃণার চোখে দেখে—অনেকের তো তাদের ছুঁলেও জাত যায়! ঠিক এমনি মনোভাব নিয়েই নাৎসী জার্ম্মানী আমাদের খাটো ভাবে অনার্য্য আখ্যা দিয়ে—আমেরিকানরা নিগ্রোদের মানুষ বলে মর্য্যাদাই দেয় না।

ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় মানুষের মধ্যে উঁচু-নীচু কিছু নেই। আসলে কেউ বেশী উন্নত, কেউ বা কম। সব জাতিই সমান উন্নত নয়। উন্নত জাতির কর্ত্তব্য হচ্ছে পিছিয়ে পড়া জাতিকে উন্নত হতে সাহায্য করা। সোভিয়েট দেশে এই বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। তাই সেখানে

মধ্য এশিয়ায়, সাইবেরিয়ায়, আরো উত্তরে বিভিন্ন জাতিরা রুশ-বিপ্লবের বিশ বছরের ভেতরেই বহু শতাব্দী এগিয়ে এসেছে! বহু পিছিয়ে-পড়া জাতি উন্নতদের সঙ্গে আজ সমান তালে চলতে শুরু করেছে।

অস্ট্রেলীয়া আবিষ্কারক ইয়োরোপীয়রা কখনো ভাবে নি যে বর্ত্তমানের ইয়োরোপীয়দের পূর্ব্বপুরুষ হচ্ছে ঐ অস্ট্রেলীয়াবাসীরাই। তাই তারা তাদের ওপর অত্যাচার করতে কসুর করে নি!

বিভিন্ন জগতের সংঘর্ষ

জাহাজে করে যেতে যেতে মানুষ বহুবার শুধু যে নতুন দেশ আবিষ্কার করেছে তাই নয়—সেই সঙ্গে বহু পুরানো যুগের স্মৃতিও টেনে বের করেছে।

অস্ট্রেলীয়া আবিষ্কার করে ইয়োরোপীয়দের কপাল খুলে গেল—তারা এক গোটা মহাদেশের ওপর কর্ত্তৃত্ব করবার অধিকার পেল। কিন্তু অস্ট্রেলীয়াবাসীদের কাছে এটা আবার তেমনি হল দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্য! শ্রমপঞ্জী (Labour Calendar) অনুসারে অস্ট্রেলীয়রা ইয়োরোপীয়দের তুলনায় অনেকখানি পিছিয়ে-থাকা যুগে বাস করত। তারা ইয়োরোপীয়দের আদব-কায়দা মানতে রাজী নয়। কাজেই ইয়োরোপীয়রা তাদের খেদিয়ে নিয়ে বুনো জানোয়ারের মত মেরেছে।

অস্ট্রেলীয়রা তখনো মাটির কুঁড়েতে থাকত। অথচ ইয়োরোপীয়রা থাকত আধুনিক ইমারতে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন ধারণাই অস্ট্রেলীয়দের তখন ছিল না। অথচ ইয়োরোপে তখন কেউ অপরের জঙ্গলে হরিণ শিকার করলে তাকে জেলে দেওয়া হত।

অস্ট্রেলীয়দের চোখে যা আইনসঙ্গত তাই ইয়োরোপীয়দের চোখে অপরাধের। এক পাল ভেড়া দেখে হয়তো তারা উল্লাসে সবাই মিলে শিকারে মেতে উঠল—অমনি আর একদিক থেকে ইয়োরোপীয় চাষীদের বন্দুক গর্জ্জে উঠল। কারণ গৃহপালিত ভেড়া ইয়োরোপীয়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Private Property) কিন্তু আদিম অস্ট্রেলীয়দের কাছে সেটা চমৎকার শিকার। ইয়োরোপীয় আইন বলে, "যে ভেড়া পালে—ভেড়া তার সম্পত্তি"—আর অস্ট্রেলীয় আইনে "যে ভেড়া মারে—ভেড়া তার।"

ইয়োরোপীয়রা অস্ট্রেলীয় আইন না জানায় অস্ট্রেলীয়রা ভেড়া শিকার করতে এলেই বাঘ ভালুক কি অন্য হিংস্র জানোয়ারের মত তাদের গুলি করে মারা হত।

আমেরিকা আবিষ্কার

আমেরিকা আবিষ্কারের সময়েও এরকম সংঘর্ষ বাধে। আমেরিকা আবিষ্কারের সময় ইয়োরোপীয়রা মনে করেছিল

এক নতুন জগৎ আবিষ্কৃত হয়েছে। নতুন জগৎ আবিষ্কার করেছিল বলেই তখন কলম্বাসকে এত বড় মনে করা হয়। বস্তুত আমেরিকা মোটেই নতুন জগৎ নয়। অজ্ঞাতসারে ইয়োরোপীয়রা আমেরিকায় তাদেরই ভুলে যাওয়া অতীতের সন্ধান পায়!

মহাসাগরের ওপারের এই সব নবাগতদের চোখে আমেরিকার অধিবাসীদের আচার ব্যবহার অসভ্য ও অবোধ্য মনে হয়েছিল। উত্তর আমেরিকার বাসিন্দারা তখনো পাথরের অস্ত্র বানাত। জীবনেও তারা লোহার নাম শোনে নি; কৃষিকাজ শিখলেও তাদের তখনো প্রধান উপজীবিকা হচ্ছে শিকার! কাঠের বাড়ীতে তারা থাকত আর তার চারদিকে বিরাট উঁচু বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখত!

আরও দক্ষিণে মেক্সিকোর লোকেরা সোনা ও তামার গহনা পরত। রোদ্দুরে পোড়ানো ইট দিয়ে বাড়ী বানিয়ে তাকে জিপসাম ধাতু (Gypsum) দিয়ে লেপে দিত। তখনকার ভ্রমণবৃত্তান্তে এদের বাসস্থান ও অন্যান্য নানা ব্যাপারের খুব ভাল বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তখনো তেমন ভাল বর্ণনা দেখা যায় না।

এই নতুন জগতের বিরাট অংশে তখনো মুদ্রার প্রচলন হয় নি। ব্যবসা-বাণিজ্য বলে কিছু ছিল না, ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদও ছিল না। আমেরিকার অনেক গোষ্ঠীর কাছে সোনা পরিচিত বস্তু হলেও তারা এর কদর জানত না।

কলম্বাসের বর্ণনায় আছে যে, বহু আমেরিকাবাসীদের গায় সোনার গহনা ছিল—কিন্তু তারা বিনা দ্বিধায় কাচের বল, কাপড় ও অন্যান্য নানা ঠুনকো সস্তা জিনিসের বদলে সেই সব সোনা দিয়ে দিত।

যখন আমেরিকাবাসীরা কাউকে বন্দী করত তখন হয় তাকে মেরেই ফেলত, নয় তাকে নিজেদের দলে টেনে নিত। কখনো তাকে দাস করে রাখত না। তেমন বড় বড় বাড়ীঘরও ছিল না। ইরোকুই কুলের (Iroquis) সবাই বারোয়ারি বসতিতে থাকত। সে জন্য তার নাম ছিল "বড় বাড়ী"। সমস্ত গোষ্ঠীই এক সঙ্গে থাকত আর কাজ করত। জমিজমা কারও একার সম্পত্তি ছিল না। তার উপর ছিল গোটা গোষ্ঠীর কর্ত্তৃত্ব। এখানে কোনও গোলাম (serf) ছিল না—বিনা পয়সায় জমিদারের জমি চষত না কেউ। সবাই ছিল স্বাধীন।

ইয়োরোপীয়রা তখন সামন্ত যুগে বাস করত। তারা জানত জগতে আছে দুটো জাত—জমিদার ও গোলাম। সেখানে কেউ অন্যের সম্পত্তি নিতে এলে পুলিশ তাকে জেল-খানায় পুরে রাখত—অথচ এখানে সে সব কিছুই নেই। এখানে নিজের গোষ্ঠীরই সবাই সবাইকে রক্ষা করে। কেউ খুন হলে অন্য সবাই সে হত্যার প্রতিশোধ নেয়। ইয়োরোপে ছিল সম্রাট, রাজা, জমিদার—কত কি। এখানে সে সব কিছু নেই। শুধু কুলের নেতারা সংঘবদ্ধ হয়ে কুলের সকলের সামনে

শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করত। কাজ অনুপাতে নেতা নির্ব্বাচিত হত আর ভাল কাজ করতে না পারলে তাকে তাড়িয়েও দেওয়া হত। নেতা কখনই কুলের অধিবাসীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিল না! তাই অনেক আদিম ভাষায় দেখা যায় "নেতা" মানে "বক্তা"।

পুরানো জগতে রাজা হচ্ছে সমাজের মাথা। পরিবারের ভেতর পিতাই কর্ত্তা। সমাজের সবচেয়ে বড় সংগঠন হচ্ছে রাষ্ট্র এবং ছোট সংগঠনটি হচ্ছে পরিবার। রাজাই প্রজাপুঞ্জের বিচার করে শাস্তি বিধান করতেন। রাজা মরে গেলে বড় রাজপুত্র সিংহাসনে বসতেন, আর বাবা মরে গেলে বড় ছেলেই সমস্ত সম্পত্তি পেয়ে যেত।

আমেরিকার নতুন জগতের আচার-ব্যবহার আলাদা। কোনও কোনও কুলে ছেলেপিলেদের উপর বাবার কোনই কর্ত্তৃত্ব ছিল না। ছেলেমেয়েরা হচ্ছে মায়ের সম্পত্তি। "বড়বাড়ীতে" সব কর্ত্তৃত্ব ছিল মেয়েদের। ইয়োরোপে ছেলেরাই বিয়ে করে বৌ ঘরে আনে—আর মেয়েরা অন্য পরিবারে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে মেয়েরাই বিয়ে করে স্বামীকে ঘরে আনে। সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপার! একজন ভ্রমণকারীর বর্ণনা শোন—"মেয়েরাই সাধারণতঃ পরিবার পরিচালনা করে, তাতে তারা পরস্পরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিলেমিশে থাকতে পারে। খাবারদাবার সব সাধারণ সম্পত্তি ; কিন্তু যে স্বামী বেশী করে খাবার যোগাড় না করতে পারে

তার কপালে অনেক দুঃখ আছে। তার যত ছেলেমেয়েই থাক না কেন, যে-কোনও মুহূর্ত্তে তাকে লোটা কম্বল গুটিয়ে পালাতে হতে পারে! সে আদেশ লঙ্ঘন করার সাধ্য নেই কারোও। মেয়েদের অসীম ক্ষমতা। প্রকৃতপক্ষে তারাই কুলের নেতা নির্ব্বাচন করত!”

আর ইয়োরোপে—পুরানো জগতে?

সেখানে মেয়েরা পুরুষের দাসী!

রুশীয় লেখক পুস্কিনের একটি গল্পে আছে কেমন করে জন ট্যানার নামে একজন ইংরেজ আমেরিকার দলে ভিড়ে যান। ওটোয়া কুলের প্রধান নিয়েৎ-নো-চুয়া নামে একটি মেয়ে তাকে আশ্রয় দেয়। তাঁর নৌকায় সব সময় নিশান বাঁধা থাকত। তাঁকে আসতে দেখলে ইংরেজরাও তোপ দেগে অভ্যর্থনা জানাত!

মেয়েদের যেখানে এত প্রতাপ সেখানে যে মায়ের দিক থেকে বংশ পরিচয় দিতে হবে—তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ইয়োরোপে ছেলেরা বাবার নাম পায়! আমেরিকার পুরানো জগতে এখানে তারা মায়ের নাম পায়! বাবা যদি ‘হরিণ’ কুলের লোক হত আর মা থাকত ‘ভালুক’ কুলে তাহলে ছেলেরা ‘ভালুক’ কুলের বনে যেত! প্রত্যেক কুলে, থাকত মেয়েরা, তাদের ছেলেমেয়ে—তাদের দৌহিত্রী—এই সব!

এত সব নতুন আচার বুঝতে না পেরে ইয়োরোপীয়রা এসব অসভ্য আচার বলে উড়িয়ে দিত! কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল যে, তীর ধনুকের যুগে তাদের মধ্যেও এই সব আচার-ব্যবহারই প্রচলিত ছিল! ‘নেতা’ শব্দটিকে তারা রাজার পর্য্যায়ে ফেলত এবং নেতাদের সংঘকে বলত রাজদরবার। আমরা এখন কোনও সেনাপতিকে রাজা বললে যে ভুল করব তারাও তখন নেতাকে রাজা বলে সেই ভুল করেছিল!

কয়েক শতাব্দী ধরে প্রবাসী ইয়োরোপীয়রা আমেরিকার হালচাল বুঝতে পারে নি। তারপরে একজন আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদ্—মরগ্যান (Morgan) ‘পুরাকালের সমাজ’ (Ancient Society) বলে একটি বইয়ে দেখান, ইরোকুই ও আজটেক সমাজ-ব্যবস্থার অনুরূপ যুগ ইয়োরোপেও ছিল। ইয়োরোপ বহু আগে সেই স্তর পেরিয়ে এসেছে। তবে ১৮৭৭ সালে মরগ্যান তাঁর বই প্রথম লেখেন।

এরা দু দল কেউ কারো আচার-ব্যবহার বুঝত না। আমেরিকানরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখত, তুচ্ছ সোনার জন্যে ইয়োরোপীয়দের মারামারি। তারা দেশ জয় কাকে বলে জানত না। তাদের ধারণা ছিল যে, জমি ক্ষেতি সমস্ত কুলের সম্পত্তি এবং কুলদেবতা জমি রক্ষা করেন। কেউ জোর করে অন্যের জমি দখল করলে ভগবানের হাতে তার নিস্তার নেই!

অবশ্য এদের মধ্যে যুদ্ধ না ছিল এমন নয়। কিন্তু যুদ্ধের পর বিজিত কুলকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আটকে তারা রাখত না

কিংবা নিজের নিয়মকানুন মত তাদের চলতে বাধ্য করত না। এমন কি তারা বিজিত নেতাকে গদীচ্যুতও করত না। মুক্তি-পণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দিত। শুধু মাত্র কুলের লোকেরাই নেতাকে পদচ্যুত করতে পারত। এইভাবে শুরু হল দুটো আলাদা জগতের বিভিন্ন জীবনযাত্রার সংঘর্ষ। আমেরিকা-বিজয়ের ইতিহাসই হচ্ছে এই দুই জগতের সংঘর্ষের ইতিকথা। আর একটি উদাহরণ হচ্ছে মেক্সিকো জয়।

ভুলের বোঝা

১৫১৯ সালে এগারখানি তিন-মাস্তুলওয়ালা জাহাজের বহর মেক্সিকোর উপকূলে দেখা দিল। সবগুলি জাহাজেরই পেট মোটা আর সামনে ও পেছনে দুই দিকই জলের অনেক উপরে ভাসছে। পাটাতনের উপর কামান, বর্শা আর বন্দুকধারীর দল গিস্‌গিস্‌ করছে। প্রধান জাহাজটির সামনে দাড়িওয়ালা চওড়া কাঁধের একজন লোক। তাঁর চোখের উপর পর্য্যন্ত ঢাকা রয়েছে টুপি। তীরের আদিম অধিবাসীদের জনতার দিকে তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। হারনান্দো কোর্টেজ হচ্ছে এঁর নাম। মেক্সিকো-বিজয়-অভিযানের তিনিই অধিনায়ক। তাঁকে অবশ্য স্পেনের সরকার চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেছিল, সেই চিঠিও তাঁর সঙ্গে আছে। কিন্তু কোর্টেজের মত দুর্ব্বার দুঃসাহসিকের এতে কি যায় আসে?

স্পেন থেকে সে তখন বহুদূরে। নিজের জাহাজে সে সম্রাটের মত ক্ষমতা রাখে।

জাহাজগুলো নোঙর ফেলল। যে সব আদিম অধিবাসীদের কোর্টেজ এর আগে দাস করে রেখেছে, তাদের দিয়ে সব জিনিস-পত্তর, কামান, বন্দুক ইত্যাদি ছোট নৌকাগুলোয় ভরা হল। ডেকের উপর এক দল ঘোড়া এনে দাঁড় করান হল। সেগুলো ঘাবরে যাওয়ায় তাদের নামানো হচ্ছিল কঠিন।

তীরের আদিম অধিবাসীরা আশ্চর্য্য হয়ে এই সব পোষাক-পরা সাদা চামড়াওয়ালা লোকগুলোর কার্য্যকলাপ দেখছিল। কিন্তু সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হচ্ছিল তারা লম্বা কেশর আর লেজওয়ালা জানোয়ার দেখে।

ফরসা লোকদের কাহিনী দেখতে দেখতে দেশে রটে গেল। সেখানে পাহাড়ে-ঘেরা এক উপত্যকায় বারোয়ারি বাড়ীর শহরে আজটেকরা বসবাস করত। এদের সবচেয়ে বড় দল হচ্ছে টেনকটিট্লান। একটি হ্রদের মাঝখানে এরা থাকত—তীরে যাতায়াতের জন্য রীতিমত পুল বাঁধা ছিল। এদের চকচকে বাড়ীর দেওয়াল ও সোনায় মোড়া উজ্জ্বল মন্দিরের চূড়া বহু দূর থেকে নজরে পড়ে। আজটেকদের সামরিক নেতা মণ্টেজুমা গোটা কুল নিয়ে সেখানকার সবচেয়ে বড় বাড়ীতে থাকত।

শ্বেতকায়দের আসবার খবর পেয়েই মণ্টেজুমা নেতৃপরিষদ আহ্বান করল। তারা অনেক গভীর আলোচনা করতে

লাগল। সবচেয়ে প্রধান সমস্যা হল তাদের কাছে এই যে, সাদারা এলোই বা কেন, আর তারা চায়ই বা কি।

তারা গুজব শুনেছে, ঐ সাদা লোকেরা সোনা ভালবাসে। তাই নেতৃপরিষদ স্থির করল যে, এদের কাছে সোনা উপঢৌকন দিয়ে এদের ফিরে যেতে বলা হবে।

এটাই হল তাদের প্রথম মারাত্মক ভুল, কারণ এতে শ্বেতকায়দের লোভই বেড়ে যাবার কথা। আদিম অধিবাসী ও শ্বেতকায় জাতি দুই পৃথক যুগে বাস করায় এ ভুল তাদের নজরে পড়ল না। বিরাট চাকার মত গোল গোল সোনার তাল সোনার গহনা, সোনার মূর্তি দিয়ে তারা দূত পাঠাল কোর্টেজের কাছে। সেই সোনা দেবার সময় থেকে আজটেকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবে গেল। শ্বেতকায়দের বৃথাই সাগরের ওপারে চলে যেতে বলা হল, বৃথাই তাদের পাহাড়ের দেশের দুঃখ কষ্টের কথা বলে ভয় দেখান হল।

এতদিন স্পেনীয়রা মেক্সিকোর সোনার গল্প শুধু উপকথার মত শুনেছিল। এবার সেগুলো চাক্ষুষ দেখতে পেল। লোভে তাদের চোখ জ্বলতে থাকে—গল্প তাহলে সত্যি!

ফিরে যাওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় ইয়োরোপীয়দের কাছে হাস্যকর মনে হল। ফিরে যাওয়া অসম্ভব। লক্ষ্য হাতে এসে গেছে। পাগল ছাড়া কেউ এখন ফিরে যাবে না।

এখানে আসতে কত কষ্ট করতে হয়েছে। বিশ্রী খাবার খেয়ে দিনের পর দিন কেটেছে। জাহাজের সে কি প্রাণান্ত

খাটুনী! মাঝে মাঝে সাগরের ঝড়-ঝঞ্ঝা এ সব কষ্ট তারা সহ্য করেছে শুধু বড়লোক হবার আশায়!

তাঁবু তুলে কোর্টেজ তখুনি রওনা হবার আদেশ দিলেন। গোলা-বারুদ-অস্ত্র শস্ত্র সব আবার ক্রীতদাসদের পিঠে চাপিয়ে লোকজন রওনা হল। ভারবাহী পশুর মত সেই সব দাসেরা বোঝার ভারে গোঙ্‌রাতে গোঙ্‌রাতে চলল। না চলে তাদের উপায় ছিলনা। কারণ কেউ পিছনে পড়লেই তলোয়ারের খোঁচায় তাদের চলতে হত।

এ সময়ের আজটেকদের আঁকা একটি ছবি এখনো সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, দলে দলে লোক পিঠে বোঝা নিয়ে তিনটে রাস্তা দিয়ে চলেছে। কারও পিঠে কামানের চাকা, কারও একগাদা বন্দুক, কারও বা পিঠে আহার্য্যের বোঝা। একজন স্পেনীয় সৈন্যাধ্যক্ষ এক আদিম অধিবাসীর চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে লাথি মারছে। সামনের পাহাড়ের গায় ক্রুস চিহ্ন আঁকা। বিজেতারা নিজেদের খুব সৎ খৃস্টান মনে করতেন বলে দেশজয়ের সময় ক্রুস চিহ্ন সঙ্গে নিতে কখনও ভুলতেন না। ছবিটিতে পথের চারদিকে কাটা হাত, পা, মাথা সব ছড়িয়ে রয়েছে।

ধীরে ধীরে স্পেনীয়রা এগিয়ে এসে এক সুদৃশ্য পার্ব্বত্য পথের আড়াল থেকে সেই হ্রদ ও হ্রদের ভেতরকার শহর দেখতে পেল। আজটেকরা তাদের কোন বাধাই দিল না। অতিথিরা স্বচ্ছন্দে শহরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারা কিন্তু

প্রথম থেকেই মোটেও বিনীত ব্যবহার করে নি। যাকে আজটেকদের নেতা বলে মনে হয়েছিল সেই মণ্টেজুমাকেই তারা প্রথমে বন্দী করল। মণ্টেজুমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কোর্টেজ তার কাছে রাজার আনুগত্য স্বীকারের দাবী করেন। বন্দীও সবিনয়ে তার সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করে গেল। অথচ তিনি যে কি বলছেন সে সম্পর্কে তার সামান্য জ্ঞানও নেই !

কোর্টেজ এতে মনে করলেন যে, বিজয়লক্ষ্মী তাঁর অঙ্কশায়িনী। তাঁর ধারণা যে, তিনি আজটেকদের রাজাকে বন্দী করেছেন আর সেই বন্দী রাজা সমস্ত ক্ষমতা স্পেনের হাতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু এই ধারণার ভেতর মস্ত বড় একটি ফাঁক ছিল। মণ্টেজুমা যেমন স্পেনের খবর কিছু রাখত না, কোর্টেজও তেমনি আসল মেক্সিকোকে জানতেন না। তাঁর ধারণা মণ্টেজুমা রাজা। আসলে সে শুধুই একজন সেনাপতি। দেশ দান করবার ক্ষমতা তার মোটেই নেই !

আজটেকরা বসে রইল না। তার নতুন সেনাপতি নির্ব্বাচন করল মণ্টেজুমার ভাইকে। নতুন নেতা আজটেকদের সব কুলকে ডাকলেন স্পেনীয়দের অধিকৃত বাড়ী দখলের লড়াই-এ। একদিকে স্পেনীয়দের কামান ও বন্দুক গর্জ্জাল। অন্যদিক থেকে এল পাথর আর তীরের জবাব। কামানের গোলার আর বন্দুকের গুলি তীরের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী সন্দেহ নেই ! কিন্তু আবার আজটেকরা নিজেদের

মাতৃভূমিকে বাঁচাবার জন্য, স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে। শত বাধা বিপত্তি তারা তুচ্ছ করবার শক্তি রাখে। ডজনে ডজনে লোক মরলে শত শত লোক তাদের জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে। আপনার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা লড়ছে। নিজের গোষ্ঠী বিপন্ন হলে আজটেকরা প্রাণের মায়া করে না, চূড়ান্ত বিপদেও ঝাপিয়ে পড়ে অক্লেশে।

সুবিধা হবে না বুঝে কোর্টেজ তাদের সঙ্গে মিটমাটের চেষ্টা করলেন। মণ্টেজুমাকে একাজে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করা হল। মণ্টেজুমা যখন তাদের রাজা তখন সে বললেই তারা যুদ্ধ থামাবে! স্পেনীয়রা মণ্টেজুমার শৃঙ্খল মুক্ত করে তাকে বাড়ীর ছাদে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু তাকে দেখে আজটেকরা উপহাস করতে লাগল। বলতে থাকল, "ভীতু, বিশ্বাসঘাতক, তুমি একজন অপদার্থ, কোনও কাজের যোগ্য নয়—মেয়েছেলে সেজে বাড়ীতে বসে থাকাই তোমার উচিৎ।"—

মণ্টেজুমা ভীষণ ভাবে আহত হল সেই লড়াই-এ। কোর্টেজ-এর অবস্থাও সুবিধা নয়। প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য মরে গেছে। তখন তিনি অনেক কষ্টে আজটেকদের হাত থেকে পালিয়ে আসেন। সৌভাগ্যের কথা যে, আজটেকরা আর তাঁকে অনুসরণ করে নি—তাহলে কোর্টেজকে আর প্রাণে বাঁচতে হত না।

কোর্টেজকে পালাতে দিয়ে আদিম অধিবাসীরা আর একটি ভুল করল। তিনি আর এক দল সৈন্য সংগ্রহ করে আবার টেনকটিট্লান অবরোধ করেন। এবার আজটেকরা কয়েকমাস আত্মরক্ষার পর হেরে গিয়ে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। গোলাগুলির বিরুদ্ধে তীরধনুকের লড়াই চলে আর কত দিন!

লৌহ যুগের মানুষ ব্রঞ্জযুগের মানুষকে হারাল। এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থার সংঘর্ষে পূর্ব্বতন গোষ্ঠীপ্রথা ভেঙে পড়ল। ইতিহাস কোর্টেজ-এর পক্ষে এসে দাঁড়াল। আজও হয়ত এইসব পার্ব্বত্য অধিবাসীদের বংশধরেরা বিরাট ধনীদের সুবিশাল খেতখামারের পিওনের কাজ করে খাচ্ছে।

জীবন্ত যন্ত্রপাতি

গত শতাব্দীতে এক লেখক চমৎকার গল্প লিখেছিলেন। গল্পে একজন লোক বাজারে গিয়ে সাধারণ জুতো কেনার বদলে ভুল করে একজোড়া হাজার মাইলের জুতো কিনেছিল। লোকটি আবার বেজায় অন্যমনস্ক। এতবড় ভুলটি তার নজরে পড়ে নি। বাজার করার জন্য সে আবার বাড়ী থেকে কি ভাবতে ভাবতে বেরিয়েছিল। হঠাৎ তার ভীষণ শীত করে হাড় কন্‌কনিয়ে ওঠে। চারদিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেল শুধু বরফ আর বরফ—দূরে দিগন্তে মিট্ মিট্ করছে সূর্য্য। তখন বুঝলে ভুল করে সে হাজার মাইলের জুতো কিনেছে।

অন্য যে-কোনো লোক হলে এই অদ্ভুত সৌভাগ্যের সুযোগ নিতে কার্পণ্য করত না। কিন্তু এ লোকটির খেয়াল ছিল শুধু বিজ্ঞানের চর্চ্চা করা! তাই ঐ জুতো পরে সে গোটা পৃথিবী ঘুরে জ্ঞান আহরণ করতে লাগল।

পুরানো কালো কোট পরে, বগলে বাক্স নিয়ে সেই লোকটি অস্ট্রেলিয়া থেকে এশিয়া, সেখান থেকে আমেরিকা, ভ্রমণ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

আমাদের তেমনি হাজার-মাইল চলার জুতো পরে মানুষের ইতিহাস খুঁজতে হবে। এই বইয়ে দেখবে আমরা কেমন করে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে, একযুগ থেকে অন্য যুগে চলে গেছি। কখনো হয়তো কালের বিরাটত্বে আমাদের মাথা ঘুরে উঠেছে—কিন্তু তবু আমরা থামি নি। আমরা জুতো পায় দিয়ে যে শুধু যুগ থেকে যুগান্তরে গিয়েছি, তা নয় —আমরা বিজ্ঞান আলোচনা করেছি। গাছপালা ও জীব-জন্তুর বিষয়, যন্ত্রপাতির উদ্ভব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম্ম ও জাতিতত্ত্বের আলোচনা করেছি।

বিষয়টি মোটেই সহজ নয়—কিন্তু তা না করেও উপায় ছিল না। আমরা এইমাত্র কোর্টেজের সময় আমেরিকায় ছিলাম। এবার তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর ইয়োরোপে যাওয়া যাক। সেখানে গিয়েও আমরা ঠিক আমেরিকার ইরোকুইস ও আজটেকদের মত গোষ্ঠীপ্রথার প্রচলন দেখতে পাব। সেখানেও আমরা সার্ব্বজনীন "বড়বাড়ী" পাব—আর

সেখানের কর্ত্রী মেয়েদের তারা খাটো চোখে দেখে না। মেয়েই সংসারের কর্ত্রী, আর সমাজের মাথা। ভাঁড়ারের, খামারের তত্ত্বাবধান সে-ই করে, চারা রোপণের জন্য মাটিও খোঁড়ে সে-ই—আবার ফসল কাটার দায়িত্বও তারই। পুরুষের চেয়ে বেশী খাটতে হত বলেই সংসারের কর্ত্তৃত্ব ছিল তার বেশী। তখন প্রত্যেক ঘরে, বাড়ীতে, গ্রামে নারীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মূর্ত্তি গোষ্ঠীর প্রথম ধাত্রীর। তাঁর আত্মাই যেন সবাইকে রক্ষা করত। গোষ্ঠীর সবাই তাঁর কাছে খাবার চাইত, শত্রুর হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে বলত।

আরও পরে এই নারীরূপিণী রক্ষাকর্ত্রী হলেন এ্যাথেনা—হাতে তাঁর বর্শা। তিনি নগরের রক্ষাকর্ত্রী দেবী। আর এ্যাথেনার বিরাট মূর্ত্তি তৈরী করে তাঁরই নামের শহরের মুখে তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

পুরানো সমাজে ভাঙন শুরু

আমাদের নজরে সব সময় না পড়লেও এটা ঠিক যে, আমাদের ভাষায় এখনো গোষ্ঠীপ্রথার নানা চিহ্ন বর্ত্তমান। বয়স্ক লোকেরা চেনা লোককে প্রায়ই 'বন্ধু' না বলে 'ভাই' বলে ডাকে। আগের যুগে বোনের ছেলে-মেয়েরা গোষ্ঠীভুক্ত হত। ভাইয়ের ছেলে-মেয়েরা তার শ্বশুরবাড়ীর আলাদা গোষ্ঠীতে থাকত। তার থেকেই বর্ত্তমানের জার্ম্মান ভাষায় ভাইপো,

ভাগনেদের একই নামে ডাকা হয়। ইংরেজীতেও 'নেফিউ' (Nephew) বলতে ভাইপো, ভাগনে দুই-ই বোঝায়। আমাদের দেশের দক্ষিণ ভারতে এবং খাসিয়া অঞ্চলে এখনো সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব বহু স্থলে মেয়েদের দিক থেকে নির্দ্ধারিত হয়

আমরা যদি এখনো নিজেদের অজ্ঞাতসারে সেই গোষ্ঠী-সমাজের আদব-কায়দা মেনে চলি তাহলে ভেবে দেখ যে সে প্রথার প্রভাব কত বেশী ছিল। সেই প্রভাব ধ্বংস হল কেমন করে ?

আমেরিকায় ইয়োরোপীয় আক্রমণকারীরা এসে গোষ্ঠী-প্রথা ভেঙে দেয়। আমেরিকা আবিষ্কারের হাজার হাজার বছর আগে আপনা থেকেই ইয়োরোপে গোষ্ঠীপ্রথা ঘুণ-ধরা জিনিসের মত ভেঙে যায়। পুরুষ যতই বাড়ীর কাজকর্ম্ম বেশী করে দেখতে লাগল ততই আগের সেই মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে গেল।

বহু যুগ আগে থেকেই সমাজে চলতি নিয়ম ছিল যে, মেয়েরা চাষবাস দেখবে আর পুরুষেরা গরুভেড়া চরাবে। যত দিন গরুভেড়ার বংশ তত বৃদ্ধি পায় নি, তত দিন মেয়েদের কাঁচা হাতের কৃষিই ছিল সমস্ত গোষ্ঠীর একমাত্র সম্বল। কিন্তু সমভূমিতে প্রায়ই ভাল আবাদ হত না। ঘাসের চাপে ফসল নষ্ট হয়ে যেত। তখন লোকে ফসল চষার আশা পরিত্যাগ করে সেই সব অঞ্চলে গরু ভেড়া চরানো শুরু করল।

কাঠের লাঙলের সাহায্যে চাষবাস করছে

ফলে বাড়ীতে শস্যের ভাঁড়ার ফুরিয়ে গেলেও কিছু ভাবতে হত না—মাংস, পনীর, দুধ দিয়েই সমস্ত গোষ্ঠী প্রাণ ধারণ করতে পারত।

সমভূমিতে মানুষের গোপালনই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। এরও পরে লাঙল দিয়ে চাষাবাদের পত্তন হয়। সুইট্জার-ল্যাণ্ডের পর্ব্বত-চূড়ায় এক প্রাচীন চাষীর ছবি পাওয়া গিয়েছে। তাতে আঁকা আছে যে, এক কাঠের লাঙলের সাহায্যে সেই চাষী চাষবাস করছে। লাঙল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রথম স্বয়ং-চালিত যন্ত্র (Locomotive) আবিষ্কার করল।

গো-পালন চাষের কাজে সাহায্য করল। গোপালক মানুষ এখন চাষীতে রূপান্তরিত হল। সেই সঙ্গে বাড়ীতেও তার কর্ত্তৃত্ব বেড়ে গেল।

তখনো অবশ্য মেয়েদের কাজের অন্ত ছিল না! তারা কাপড় বুনত, ফসল বেছে ঘরে তুলত আর ছেলে-পুলেদের লালনপালন করত! কিন্তু আগের মত আর তারা সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্রী রইল না। গোপালন ও চাষবাসে মানুষই এগিয়ে গেল!

বাড়ীর কাজের জন্য মানুষ আর ধমক খেত না, বরঞ্চ তারাই আবার মেয়েদের ধমকাতে শুরু করল। আগের আমলে ঠাকুরমা, শাশুড়ী, খুড়ী, পিসী সবাই প্রয়োজন হলে অক্লেশে পুরুষদের গোষ্ঠী থেকে তাড়িয়ে দিত। এখন আর তা

পারত না। বরঞ্চ তারাই আদর করে পুরুষদের গোষ্ঠীতে আটকে রাখতে চাইল। এই ভাবে ধীরে ধীরে পুরানো সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে থাকে। আগের সংস্কারও লোকের ক্রমশঃ ভাঙতে লাগল। আগে স্ত্রী স্বামীকে সংসারে আনত, এখন স্বামীই স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিজের পরিবারে নিয়ে এল।

তদানীন্তন সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিল বলেই লোকে প্রথমটায় এসব নতুন বিধান ভাল চোখে দেখত না। যে বিয়ে করে বৌকে নিজের বাড়ী নিয়ে যেত তাকে সবাই দোষ দিত। প্রথমটায় কেউ প্রকাশ্যে কনে নিয়ে যেতে পারত না। চুরি করে, কিংবা জোর করে সে প্রথমটায় বৌকে বাড়ী নিয়ে যেত!

কোন অন্ধকার রাত্রে বরের আত্মীয়স্বজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চুপিচুপি কনের বাড়ীতে চড়াও হত। কুকুরের চীৎকারে সকলের ঘুম ভেঙে যেত। কিন্তু তারা তৈরী হবার আগেই হয়তো বর কনেকে চুরি করে নিয়ে দে ছুট্!

বছরের পর বছর যায়। এককালে যেটা ছিল চলতি আইনের চোখে অপরাধ, তাই ক্রমে আইন হয়ে দাঁড়াল! বর ও কনে পক্ষের ভেতরের লড়াই রূপান্তরিত হয়ে উৎসবে পরিণত হল। যৌতুক নিল রক্তাক্ত যুদ্ধের স্থান। কনের মা-বোনের কান্নাও উৎসবের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল—আর তার সমাপ্তি হল নিমন্ত্রণে। পুরাকালের এক গোত্র ছেড়ে

অন্য গোত্রে যাবার সময় মেয়েদের কান্নার পালা অল্পবিস্তর এখনো বজায় আছে।

মেয়েদের এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনে মোটেই হিংসা করবার কিছু নেই। নতুন সংসারে এসে স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে স্বামীর অধীন থাকতে হত! তাকে সহানুভূতি করবার এখানে কেউ নেই। সবাই স্বামীর পক্ষে। সবাই চাইল ঝি-চাকরাণীর মত বৌ এসে খেটেই খাক! সে যেন বসে না থাকে! এই ভাবে ক্রমে মাতৃকর্ত্তৃত্বের অবসানে পিতৃকর্ত্তৃত্ব কায়েম হল।

ছেলেমেয়েরা আর তাদের মামার বাড়ীতে থাকত না। তারা থাকত বাবার সঙ্গে। বংশপরিচয়ও এখন বাবার দিক থেকে দেওয়া হত। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীর নামের সঙ্গে আর একটি নামও তাদের নিতে হল "অমুকের ছেলে!"

এখনো এর অস্তিত্ব দেখা যায় ইংরেজী পদবীতে—যেমন "পিটার রবার্টসন" অর্থাৎ রবার্টের ছেলে পিটার! কেউ এখন স্বপ্নেও ভাবতে পারে না যে, ছেলের নাম দেওয়া যেতে পারে মায়ের নাম অনুসারে "পিটার হেলেনসন"।

প্রথম যাযাবর

চাষ-আবাদের ক্ষেত্রে মানুষ যে বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছিল তার ফলে তার আর আহার্য্য নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। এখন প্রচুর খাবার। সমভূমিতে হাজারে হাজারে গরু-ভেড়া

চরত। ক্ষেতে চাষীরা ক্লান্ত বলদকে উৎসাহ দেবার জন্য চীৎকার করত।

উর্ব্বর উপত্যকায় প্রথম আঙুর ফলের বাগানে আঙুর ধরল। সন্ধ্যে বেলায় সবাই ডুমুর গাছের তলায় এসে বসল। কঠোর পরিশ্রমের ফলে মানুষ অবশ্য খুব বেশী বেশী খাবার পাচ্ছিল সব সময়ই; কিন্তু তার জন্যে খাটতেও হত তেমনি বেশী। প্রত্যেকটি আঙুরের থোকা, যবের শীষ জুড়ে ছিল মানুষের খাটুনি।

থোকা থোকা আঙুর পেড়ে এনে তাকে পাথরের যাঁতায় পিষে সেই রক্তের মত লাল আঙুরের রস মানুষ চামড়ার বোতলে রাখত। দলে দলে লোক বসে আঙুরের রসের স্তোত্র পাঠ করত—চামড়ার পোষাক পরা সুন্দর দেবতার স্তব পড়া হত—দেবতাকে যত কষ্ট দেওয়া হয়েছে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া হত। সেকালে নদীর নীচু মাটিতে যেন প্রকৃতি দেবী নিজেই ফসলের দায়িত্ব নিতেন। কিন্তু এখানে তাদের বিশ্রাম ছিল না। খাল খুঁড়ে মানুষকে সব সময় ক্ষেতে জল ধরে রাখতে হত। নদীই জমি উর্ব্বরা করত বলে লোকে নদীর কাছে প্রার্থনা জানাত। তারা ভুলে যেত যে, নদীর পারের জমিতে নিজেরা না খাটলে শুধু প্রার্থনায় কিছুই সম্ভব নয়।

একদিকে চাষের কাজও যেমন কষ্টসাধ্য হচ্ছিল অন্য দিকে তেমন রাখালের কাজও ক্রমশঃই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

তল্পিতল্পা গুটিয়ে সবাই গরুভেড়ার পিছনে ছুটত

যতই গরুভেড়ার পাল বৃদ্ধি হচ্ছিল ততই তাদের কাজ বেড়ে যায়। দু-এক ডজন গরুভেড়া তদারক করা এক কথা আর হাজার হাজার গরুভেড়ার তদারক সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। আবার বড় দল হয়তো দু দিনেই একটি মাঠের ঘাস সাফ করে ফেলল, তখন তাদের অন্য দূরের মাঠে চরাতে নিয়ে যেতে হত! ক্রমেই এত দূরে দূরে নিয়ে যেতে হল যে গোটা গ্রাম শুদ্ধ লোকই তল্পিতল্পা গুটিয়ে গরুভেড়ার পেছনে ছুটত! আগে আগে চলত গরু ভেড়ার পাল আর পেছনে থাকত উটের পিঠে বোঝাই করা তাঁবু। তাদের পেছনে পড়ে থাকত আগাছায় ভরা মাঠ। সেদিকে তারা মোটেই ভ্রূক্ষেপ করত না। তখন সমভূমিতে ভাল ফসল কদাচিৎ পাওয়া যেত।

মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম শ্রম-বিভাগ দেখা দিল। শুধু মানুষে মানুষে নয়—কুলের ভেতরেও। সমভূমিতে থাকত গোপালক রাখালের দল। যারা গরুভেড়ার বিনিময়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করত। তারা কোনও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকত না, সর্ব্বদা ঘুরে বেড়াত! এ সব যাযাবর ছিল স্বাধীন ও বুনো স্বভাবের।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোলা জায়গায় তারা তাঁবু খাটাত। গোটা সমভূমিই ছিল তাদের আবাস। সুদীর্ঘ যাত্রাপথে উটের পিঠের দোলায় ছেলেরা দোল খেতে খেতে যেত।

যাযাবরদের জীবন কিন্তু মোটেই সুখের বা শান্তির ছিল না। যাত্রাপথে কোনও চষা জমি পড়লে তারা প্রায়ই অন্যের ফসল কেড়ে নিত। পাহাড় থেকে নদীর উপত্যকায় নামবার সময় তারা গ্রামের পর গ্রাম লুট করে, শস্য নষ্ট করে তাদের গরুভেড়া চুরি করে নিয়ে যেত।

যাযাবরদের লোকের দরকার ছিল বেশী। যত বেশী লোক থাকত, ততই তাদের গরু ভেড়া চরান সহজ হত। তাদের কুলে সব সময়েই লোকের ঘাটতি হত। কারুর হয়তো দশটি ছেলে। তাতে পোষাত না! মানুষের তুলনায় গরুভেড়ার পালের বংশবৃদ্ধি হত ঢের বেশী। কাজেই তারা অন্য কুলের লোককে জোর করে ধরে দাস বানিয়ে রেখে খাটিয়ে নিত।

এই ছিল যাযাবর গোপালকদের কাজ!

আগের যুগে পরাজিতদের বন্দী করার প্রথা ছিল না; কারণ নতুন লোক এলেই যে আয় বাড়ত তা নয়। সে মানুষ যেমন খাটত, তেমনি তাকে খেতেও হত। হয়তো নিজের সমস্ত উপার্জ্জনই লাগত খেতে। কিন্তু এখন অবস্থা হল সম্পূর্ণ উল্টো। এখন একজনের পরিশ্রমলব্ধ জিনিসে অনেকেই ভাগ বসাতে পারত! একজন বন্দী খেটে নিজেকে ও তার প্রভুকে স্বচ্ছন্দে খাওয়াতে পারত! কর্ত্তার শুধু নজর রাখতে হত, বন্দী যেন কম খেয়ে বেশী পরিশ্রম করে।

মানুষ এমনি করে এবার প্রতিবেশীকে জীবন্ত যন্ত্রে পরিণত করল। মানুষের অধঃপতন ঘটিয়ে গরুঘোড়ার মত তার ঘাড়ে যোয়াল চাপিয়ে দিতে মানুষ দ্বিধা করল না। প্রকৃতি-বিজয়ের অভিযানে কালক্রমে মানুষ ঘটনাচক্রে প্রতিবেশীর দাস হয়ে পড়ল। আগে জমি ছিল সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি, যারা কাজ করত তাদেরই। এখন দাস যে জমি চষত তাতে তার অধিকার ছিল না। যে বলদ দিয়ে সে চাষ করত সে বলদ তার নিজের নয়। যে ফসল সে ফলাত, তাও যে তার নয়!

অতীতে মিশরের দাস তাই জমি চষবার সময় গান ধরত—

"মাঠের চারা নষ্ট কর রে
ফসল যেন ভাল নাহি হয়
ও ফসল তো আমার নয় রে—সবই যে কর্ত্তার"।

স্মৃতি ও স্মৃতি-চিহ্ন

অতীতের বিষয় অনুশীলন করতে আমাদের এতদিন নানা কষ্টের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। কখনো গুহার গোলক ধাঁধাঁয় আটকে গেছি, নয়তো এমন অনেক জিনিস পেয়েছি যা নিয়ে জল্পনা-কল্পনায় জড়িয়ে পড়েছি!

এতদিনে আমাদের যাত্রাপথে নানা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি! এতদিনে সর্ব্বপ্রথম কবর ও মন্দিরের গায় খোদাই করা শিলালিপি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো মোটেই আগের ম্যাজিক ছবির মত দেখতে নয়। বর্ত্তমানের মত অবশ্য তখনকার অক্ষর এত স্পষ্ট হয় নি। তখন ষাঁড়কে ষাঁড়ের মত করে এঁকেই দেখান হত। ডালপালা সমেত গোটা গাছের ছবি পাওয়া যেত।

লেখকের জন্ম ইতিহাস শুরু হয় এই চিত্রলিপি থেকেই! ছবির বদলে চলতি চিহ্ন দিয়ে মনের কথা বোঝাতে বহু দিন লেগেছিল।

ইংরেজী অক্ষরের দিকে নজর দিয়ে বলা কঠিন যে, কোন্ অক্ষর কি থেকে এসেছে। কে কল্পনা করতে পারবে যে, 'A' অক্ষরটি এসেছে ষাঁড়ের মাথার ছবি থেকে? কিন্তু 'A'-কে উল্টে দিলেই একটি মাথার আভাস পাবে— দুটো শিং লাগানো। অতীতে সেমাইট জাতি এই শিং-ওয়ালা মাথাকে বলত 'A'। তারা ষাঁড়কে বলত 'আলেফ্' (Aleph),তারই প্রথম অক্ষর ছিল এই "A"! ঠিক এই ভাবেই ইংরাজীর প্রত্যেকটি অক্ষরের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়! 'O' হচ্ছে চোখ, 'R' হচ্ছে লম্বা ঘাড়ের উপর একটি মালা।

হাজার মাইলের জুতো প'রে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি এবার। প্রথম চিত্রলিপির যুগে এসে পৌঁছেছি!

মানুষ ধীরে ধীরে লেখা শিখল। যতদিন খুব বেশী কিছু শেখবার ছিল না, ততদিন মানুষ সব কথা মুখস্থ করে। গাথা, উপকথা সব কিছুই মুখে মুখে বংশপরম্পরায় চলে এসেছে! সে কালের প্রত্যেক বৃদ্ধই ছিল মূর্ত্তিমান এক একখানি গ্রন্থ।

এই সময় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্মৃতিশক্তির সহায়তা করল। লিখিত ও কথ্যভাষার সাহায্যে মানুষ উত্তর-পুরুষের ভেতর অভিজ্ঞতা দান করে যেত। নেতার সমাধিস্তম্ভের উপর তাঁর কীর্ত্তি-কলাপের কথা লেখা থাকত যেন ভবিষ্যতের বংশধররা তাঁর কীর্ত্তিকলাপের কথা জানতে পারে। অন্য সব প্রতিবেশীদের কাছে দূত পাঠাবার সময় তারা গাছের বল্কলের ওপর কিংবা মাটির বাসনে চিত্রলিপির সাহায্যে দরকারী কথা লিখে দিত। পৃথিবীর প্রথম বই হচ্ছে সমাধিস্তম্ভ ও প্রথম অক্ষর লেখা হয় বল্কলে।

আজ আমরা রেডিয়ো, টেলিফোনের গর্ব্ব করি। হাজার হাজার মাইল দূরে রেডিয়ো মারফৎ মানুষের কথা পৌঁছান যায়; রেকর্ড করা আমাদের কণ্ঠস্বর যুগ যুগান্ত ধরে রক্ষিত হবে! এগুলো নিঃসন্দেহে আমাদের বিরাট সাফল্য। কিন্তু এ সাফল্য যেন আমরা বাড়িয়ে না দেখি।

বহু যুগ আগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা দেশ ও কালের ব্যবধান অস্বীকার করতে চেয়ে অল্পবিস্তর সাফল্য লাভ করে ছিলেন। বল্কলে ভাষা লিখে আর স্মৃতিস্তম্ভ করে কালের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলেছিলেন।

আমাদের যুগে বহু স্মৃতিস্তম্ভের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। তাদের গায় সেকালের বীরদের কাহিনী, যুদ্ধ জয়ের গাথা, সৈন্য ও সেনাপতিদের ছবি আঁকা আছে। বিজেতারা বীর দর্পে যুদ্ধ জয় শেষ করে ফিরে আসছে আর তাদের পেছনে নত মস্তকে আসছে হাত-বাঁধা বন্দীর দল সার বেঁধে! সেই সব চিত্রলিপির ভেতর আমরা প্রথম বন্দীর চিহ্ন—সেকালের হাতকড়া—দেখতে পাই।

এখন থেকে শুরু হবে মানুষের জীবনে নূতন অধ্যায়—দাসত্বের আরম্ভ।

মিশরের মন্দিরের গায় পরে আমরা আরও এই সব নানা ছবি আঁকা দেখেছি। একটিতে এক লম্বা বন্দীর সারি একটি দালান গাঁথবার ইট তৈরী করছে। একজনের ঘাড়ে ইটে বোঝাই বাক্স; সে দুই হাত দিয়ে তা ধরে আছে। আর একজন লম্বা লাঠির আগায় ঝুড়ি বেঁধে ইট বইছে ঠিক জল আনবার মত করে! রাজমিস্ত্রীরা দেয়াল গাঁথছে আর পরিদর্শক এক মস্ত ইঁটের ওপর বসে সব তদারক করছেন। তিনি দুই হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসেছেন আর হাতে রেখেছেন একটি ছড়ি। তিনি কাজ করেন না, তাঁর কাজই হচ্ছে অন্যকে খাটান। আর একজন পরিদর্শক একটু দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হাতের লাঠি দিয়ে তিনি একজন দাসের মাথায় মারছেন।

স্বাধীন মানুষ ও দাসের কথা

“পেঁয়াজের গাছে যেমন গোলাপ হয় না, তেমনি দাসীর গর্ভে স্বাধীন মানুষ জন্মায় না—”

গ্রীক কবি থিওগ্নিস (Theognis) যখন এই পঙ্‌ক্তিটি লেখেন তখন সমাজে দাস-ব্যবস্থা বেশ কায়েম হয়ে বসেছে। তার আগে দাসদের কখনই “নীচ জাতীয়” বলে উপেক্ষা করা হত না। স্বাধীন ও দাস সবাই এক বড় পরিবারের মত এক সঙ্গে কাজ করত, থাকত, খেত। পিতা ছিলেন বৃহৎ পরিবারের কর্ত্তা (Patriarch)! তাঁর ছেলে, ছেলের বউ, নাতিনাতনী, দাসদাসী—সবাই এক সঙ্গে বাস করত। কেবল পিতাই একমাত্র দুর্বিনীত ছেলে কি দাসকে বেত মারতে পারতেন।

পুরানো বুড়ো দাস তার প্রভুকে আহ্বান করত ‘ছেলে’ বলে, আবার প্রভুও তাকে ‘বাবা’ বলে সম্বোধন করতেন। এটাই ছিল তদানীন্তন রীতি।

পুরানো উপকথা ওডেসী (Odyssey) পড়ে থাকলে তোমাদের মনে থাকতে পারে যে, ভৃত্য ইউমিউস প্রভুর সঙ্গে একই টেবিলে খাবার খেত। সেই শূয়োরপালক ইউমিউসকে তখনকার গায়কেরা সবাই ‘দেবতার মত’ বলে বর্ণনা করত। এত সব সত্ত্বেও কিন্তু ওডেসী সবটা সত্যি নয়। শূয়োরপালক ইউমিউস কখনই দেবতা কিংবা তার

প্রভুর সমান ছিল না। তাকে অনেক কাজ বাধ্য হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে হত—কিন্তু তার প্রভু ইচ্ছে করলে নাও খাটতে পারতেন। পরিবারের অন্যের চেয়ে দাসকে বেশী খাটতে হত। তাকে পারিতোষিক দেওয়া হত কম। দাস ছিল সম্পত্তির মত। প্রভু সেই সম্পত্তির অধিকারী। প্রভু মরে গেলে দাসও অন্য সব জীবজন্তুর সঙ্গে তাঁর ছেলের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হত।

আগের পারিবারিক সাম্য এরপর সামাজিক ব্যবস্থায় অবশিষ্ট ছিল না, বলাই বাহুল্য। এখানে পিতা সন্তানের শাসক, স্ত্রী স্বামীর অধীন, পুত্রবধূ শ্বশুরের এবং ছোট বউরা বড় বউদের অধীনে থাকত। সবার নীচে ছিল দাসশ্রেণী।

বিভিন্ন কুলের ভেতরকার সাম্যও নষ্ট হয়েছিল। অনেকের বেশী গরু ভেড়া ছিল, অনেকের ছিল কম। গরু ভেড়ার দামও ছিল বেশী। তার বিনিময়ে কাপড় ও অস্ত্রশস্ত্র কেনা যেত। আগেব দিনের মুদ্রা যে ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে তৈরী হত সেটা হঠাৎ হয় নি।

কিন্তু গরু ভেড়ার চেয়ে দাসের মুল্য আরও বেশী—দাস রাখলে যে, সে গরু ভেড়া শুয়োর ইত্যাদি সব চরাতে পারবে। সারাদিন চরিয়ে বৈকালে সে সমস্ত গরুর পাল খেদিয়ে তাদের খোঁয়াড়ে এনে ঢুকিয়ে রাখবে। ফসল তোলার সময়েও সে সাহায্য করবে। দাস সর্ব্বদা স্বাধীন লোককে সাহায্য করবে —কিন্তু তার কপালে সব সময়েই পড়বে কঠিন কাজের ভার।

এ থেকেই যুদ্ধ ক্রমে লাভজনক জিনিস হয়ে দাঁড়াল। কারণ যুদ্ধে জিতলে দাস পাওয়া যায়; আর দাস পেলেই সম্পদ বাড়বে। সুতরাং দাসদের বাড়ীতে গরু ভেড়া তদারক করতে রেখে স্বাধীন লোকেরা লড়াই করতে যেত।

যুদ্ধের সঙ্গে লোকের কাজও বেড়ে গেল। তাদের ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, রথ সব দরকার হল। রথের সঙ্গে দুই ঘোড়া জুড়ে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চালনা করা হত। সৈন্যরা বর্ম্ম পরে, শিরস্ত্রানে মাথা ঢেকে, বাঁ হাতে ঢাল নিয়ে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করত। বারোয়ারী বাড়ীর চারদিক ঘিরে বিরাট মজবুত দেয়াল গেঁথে তোলা হল। যে গোষ্ঠী যত ধনী তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও হল ততই সুদৃঢ়। ক্রমে ক্রমে বিরাট দুর্গ তৈরী করে তারা সেখানে বসবাস করতে লাগল।

সেই দুর্গের দেওয়াল থেকে দেশের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যেত। যখনই আকাশে ঘোড়ার খুরের ধূলো উড়ত—কিংবা বর্শার ফলকে আকাশ ঝলসে উঠ্‌ত তখনই দুর্গের ভেতর সবাই অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে পড়ত সংগ্রামের জন্য। চাষী তাড়াতাড়ি গরু ভেড়া খোঁয়াড়ে নিয়ে যেত। এই ভাবে একে একে সবাই যখন ভেতরে ঢুকে পড়ত তখন সেই দুর্গের বিরাট দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত। সেই দেওয়ালের গায়ে গায়ে ওৎ পেতে ও অন্যান্য নানা জায়গা থেকে সৈন্যেরা শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষা করত।

আক্রমণকারীরা এসে দুর্গের বাইরে তাঁবু খাটাত। তারা ভাল করেই জানত এ সমস্ত দুর্গ জয় করা তত সহজ নয়। হয়তো মাসের পর মাস কেটে যাবে দুর্গ জয় করতে। প্রত্যেক দিন ভোরে দুর্গের ভেতর থেকে এক দল সৈন্য বেরিয়ে এসে শত্রুর মুখোমুখী যুদ্ধ করত। যুদ্ধ করতে করতে গভীর রাত্রে অবসন্ন দেহে সবাই সে দিনের মত যুদ্ধ থামিয়ে আবার দুর্গে ঢুকে পড়ত। একদল যেমন আত্মরক্ষার প্রেরণায় সংগ্রাম করত অন্য দল তেমনি যুদ্ধ করত সম্পদের লোভে।

এইভাবে দিনের পর দিন যায়। দুর্গে আবদ্ধ হয়ে সঞ্চিত খাদ্য দ্রব্যে কদিন চলতে পারে? খাবার ফুরিয়ে গেলে দুর্গময় হাহাকার ওঠে। সেই সঙ্গে প্রত্যেক বারের লড়াইয়ে লোকও যাচ্ছে কমে। অবশেষে তাদের বাধাদানের ক্ষমতা কমে গেলে আক্রমণকারীরা হুড়মুড় করে দুর্গের ভেতর ঢুকে পড়ত। সেই দুর্গের সবটা ধ্বংস করে তারা গরু, মেয়ে, পুরুষ সবাইকে বন্দী করে নিয়ে যেত দাস করবার জন্যে।

মৃতের মুখে জীবন্তের কথা

অনেক দেশে সমভূমি কিংবা খোলা মাঠের ভেতর সারি সারি উঁচু ঢিবি দেখতে পাওয়া যায়। ওগুলো যে কি, স্থানীয় অধিবাসীরা তা বলতে পারে না। পুরাতত্ত্ববিদেরা এ সবকে 'স্তূপ' বলেন। সাধারণতঃ খুব পুরানো জিনিস নিয়ে যেমন

গল্প রচিত হয় এ সব নিয়েও তেমনই নানা উপাখ্যান রচিত হয়েছে।

পুরাতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ঐ সব স্তূপে বহু আগে লোকদের সমাধি দেওয়া হত। ঐগুলো খুঁড়ে এখনো কঙ্কাল পাওয়া যায়। সেই কঙ্কালের সঙ্গে নানা জিনিসপত্তরও থাকতে পারে। মৃতের বন্ধুবান্ধবরা ঐ সব জিনিসপত্তর সমাধিতে রেখে দিত। তাদের ধারণা ছিল যে, মরলেও লোকের খাবার প্রয়োজন হয়, খাটতে হয়—মেয়েদেরও বোনার কাজ করতে হয়। তখন পর্য্যন্ত মানুষের সম্পত্তি খুব বেশী না থাকায় অতি পুরাতন সমাধিতে শুধু বর্শা, কবচ এই সব পাওয়া যেত। ধনী ও দরিদ্রের সমাধি আরও পরের যুগের। দক্ষিণ-রুশিয়ার ডন নদীর তীরে তিন রকমের সমাধি পাওয়া গেছে। প্রথমটি ধনীব দ্বিতীয়টি মধ্যবিত্তের ও তৃতীয়টি গরীবদের।

প্রথম সারিতে খুব উঁচু সমাধিতে গ্রীক ফুলদানী, সোনার বর্ম্ম ও চমৎকার কারুকার্য্য খচিত ছোরা পাওয়া গেছে। মাঝের সারিতে সোনার কিছুই নেই। এমন কি ফুলদানীও নয়। গরীবদের সমাধির কথা না বললেও চলে। সেখানে কোন বর্ম্ম পর্য্যন্ত নেই। আশে পাশে বড় বড় স্তূপের চেয়ে গরীবদের ছোট ছোট স্তূপের সংখ্যাই বেশী। তার ভেতর মৃতের এক পাশে আছে একটি বর্শা, অন্য পাশে জল খাবার গেলাস। সমাজে যে গরীব, সমাধি-স্তূপেও সে গরীব!

এই সব মৃতের সমাধি থেকেই আমরা জানতে পারি যে সমাজে তখন ধনী-দরিদ্র সৃষ্টি হয়েছিল।

সমাধির কাছাকাছি সেকালের বসতির দুটো দেওয়াল ছিল। একটি বাইরের আর একটি ভেতরের। সেই ভেতরের দেওয়ালের মধ্যে নানা দামী জিনিস থাকত। সেখানে সুদূর গ্রীস থেকে আনা ফুলদানাও পাওয়া গেছে। সেই ভেতরের দেওয়াল ও বাইরের দেওয়ালের মাঝখানে এ সব কিছুরই অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ সেই মাঝখানের লোকের এ সব জিনিসের কোনই দরকার ছিল না।

কাজেই দেখ, সমাধি থেকে আমরা মৃতের কথা জানতে পারলাম। অনেক সময় অনেক ভয়াবহ সত্য এই সব সমাধি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। কখনো জোর করে দাসকে মেরে প্রভুর সঙ্গে সমাধিস্থ করা হত। কখনো স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে সমাধি দেওয়া হত। গোষ্ঠীর পিতা মারা গেলে তিনি দাস ও স্ত্রী সবাইকেই সঙ্গে করে সমাধিস্থ হতেন।

মানুষ এক নতুন ধাতু আবিষ্কার করল

হাজার হাজার বছর ধরে যে সব অমূল্য সম্পদ মাটির নীচের অন্ধকারে সমাধিস্থ ছিল—এখন তার অনেক জিনিসই পৃথিবীর নানা জায়গায় মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। দর্শকরা নির্ব্বাক বিস্ময়ে সোনার বাঁটের তলোয়ার ও তার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা শেকলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঐ সব কাজে কত নৈপুণ্য আর পরিশ্রম ই না লেগেছে !

অতি সাধারণ ব্রোঞ্জের ছোরা করতেই অনেক দিন লেগেছে। প্রথমে তাদের খনিজ ধাতু সংগ্রহ করতে হত। রাস্তায় ঘাটে খাঁটি তামা খুঁজে পাবার দিন তখন ফুরিয়ে গিয়েছে। আগে যেমন পাথর খুঁজতে তাদের মাটির নীচে যেতে হত এবার তেমনি তামার জন্যে খনি খুঁড়তে হল।

সহজে মাটি খোঁড়ার এক উপায় তারা বের করল। তারা আগে খনির মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে চারধারের দেওয়ালগুলো গরম করে তুলত। তারপর সেই গরম দেওয়ালে জল ঢেলে দিত। তখন গরমে সেই জল বাষ্পীভূত হত। সেই বাষ্পের চাপে, চারপাশের পাথরের দেওয়াল ভেঙে পড়ত।

আগের দিনের খনি ছিল অনেকটা আগ্নেয়গিরির মত দেখতে। সর্ব্বক্ষণ তার মুখ থেকে ধোঁয়া উঠ্ছে। ইংরাজীতে আগ্নেয়গিরিকে ভলকানো (Volcano) বলে। এই শব্দটি থেকেই কর্ম্মকার দেবতা ভালক্যান (Vulcan) শব্দটি উদ্ভূত। তখন খনিজ ধাতু গলাতে খুব নৈপুণ্য দরকার হত। সেই ধাতু গলাবার সময় মানুষ খনিজ টিন তামার সঙ্গে মিশিয়ে দিত। এর ফলে যে তামা মিলত তা খাঁটি তামা নয়, তাতে মেশানো থাকত তামা আর টিন। একেই বলে ব্রোঞ্জ, এক সম্পূর্ণ নতুন ধাতু।

অনেক আগের দিনে যে কোনও লোকই খুব সহজে অন্যের কাজ করতে পারত। কোনও কাজ শেখা তেমন কঠিন ছিল না।

কিন্তু এখন অনেক দিন লাগত ধাতু গলান শিখতেই। বাবার কাছ থেকে ছেলেরা অনেক কাজ শিখত। এমনি করে কোনও বিষয়ে নৈপুণ্য গোষ্ঠীগত হয়ে দাঁড়াল। এক-একটি গোটা সম্প্রদায়ের কেউ কুমোর, কেউ বা কামার, কেউ কেউ তামাকর হয়ে পড়ল। চারদিকে তাদের নামকামও ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আমার তোমার

প্রথম প্রথম সব কারিকরকে নিজের সম্প্রদায়ের জন্যই খাটতে হত। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল—ততই কামার কুমোররা নিজেদের তৈরী জিনিসের বিনিময়ে খাদ্য শস্য ইত্যাদি নিতে লাগল। এই বদলী প্রথা চালু হওয়ার ফলে আগের গোষ্ঠীপ্রথা ভাঙতে শুরু করল।

আগে গ্রামের প্রত্যেকেই সব বিষয়ে প্রত্যেকের সমান ছিল। এখন ধনী গোষ্ঠী ও দরিদ্র গোষ্ঠীর ভেতর পার্থক্য দেখা দিল। আবার কারিকর ও চাষীর ভেতরেও এমনি বিভেদ এল।

যতদিন কারিকররা গোটা সম্প্রদায়ের জন্য খাটত ততদিন সমস্ত সম্প্রদায়ই তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিত। লোকে সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করত। একসঙ্গে তার ফলও ভোগ করত। কিন্তু যখনই কোনও কারিকর স্বেচ্ছায় তার অস্ত্রশস্ত্র অপর কারো সঙ্গে বিনিময় করত—তখন তার বদলে

পাওয়া জিনিস আর সে গোষ্ঠীর অন্যান্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চাইত না। তার মনে হত, সে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই এ সব জিনিস উপার্জ্জন করেছে—তাই তাতে অন্যদের ভাগ দেবে কেন ?

লোকে আলাদা আলাদা বাড়ীতে থাকতে শুরু করল। গ্রীস্, মিসিনী, টিরিন-এর ধ্বংসস্তূপ-ই এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। সবচেয়ে ধনী পরিবার পাহাড়ের উপর সুদৃঢ় দেওয়ালের প্রাচীরের মধ্যে থাকত। সেখানে সম্প্রদায়ের সামরিক নেতা, তার ছেলে, বৌ সবাইকে নিয়ে বাস করত। নীচে সমভূমি ও উপত্যকায় ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে থাকত গরীব চাষীর দল। ধনীদের এলাকার উপকণ্ঠে বসবাস করত কামার, কুমোর ও অন্য কারিকররা।

এ রকম শহরে মানুষ সমান থাকতে পারে না। দরিদ্র জনসাধারণ সামরিক নেতার ঐশ্বর্য্য দেখে মনে মনে হিংসা করত, আর বাইরে তাকে সবচেয়ে বেশী সম্মান দেখাত। তাদের ধারণা ছিল যে, স্বয়ং ভগবান এদের পক্ষে। অত্যন্ত শৈশব থেকেই পুরুতরা তাদের মাথায় এ ধারণা ঢুকিয়ে দেয়।

চাষীরাও কারিকরদের কিংবা খনি মজুরদের 'ভাই'এর চোখে দেখত পারত না। সারা গায় কালিঝুলি মেখে নিয়ে খনি থেকে কেমন করে যে তারা তামা তুলছে সেটা চাষীরা বড় একটা বুঝত না। এরা দেখত শুধু গর্ত্তের ভিতর থেকে ধোঁয়া উঠছে আর তারপরে খনির মজুররা বেরিয়ে আসছে খাঁটি

তামা বা ব্রোঞ্জ নিয়ে! এর ভেতরে কি হচ্ছে কে জানে! সে এত সব ধাতুই বা পায় কেমন করে? নিশ্চয়ই কেউ তাকে বলে দেয় কোথায় ধাতু পাওয়া যাবে আর কেমন করেই বা তা পাওয়া যাবে। নিশ্চয়ই ভূত কিংবা এমনি কোন এক অদৃশ্য অভিভাবক তাদের যথাস্থানে নিয়ে যায়। সুতরাং যারা খনিতে কাজ করে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ!

শুধু গ্রীসে নয় পৃথিবীর সব জায়গাতেই লোকে এই রকম করে ভাবত। প্রায় সবদেশেই এমনি যাদুকর কামারের গল্প প্রচলিত আছে।

জনসাধারণ তখনো জানত না, কেমন করে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য হয়েছে। তাই তারা মনে করত, ভগবানই মানুষের অদৃষ্ট নির্দ্দিষ্ট করে পাঠিয়েছেন। ভগবান সব সময়েই ধনীর পক্ষে থাকেন, দরিদ্ররা তাঁর কৃপা লাভ করতে পারে নি।

বিজ্ঞানের আরম্ভ

মানুষের ধারণা ছিল সমস্ত পৃথিবীটাই এক বিরাট ভোজবাজী! সে এর কিছু বুঝতও না, ব্যাখ্যাও করতে পারত না। তখনো তাদের অভিজ্ঞতার পরিধি এত কম ছিল যে, রাত্রির অন্ধকারের পর যে আবার দিন হবে সেটা তারা জানত না। তাই ভোরে যাতে আবার আলো হতে পারে সেজন্য তারা সূর্য্যের স্তবস্তুতি করত।

মিশরের লোকেরা মন করত যে, ফারাও (Pharaoh) হচ্ছেন সূর্য্যের দেবতা! প্রত্যেক দিন ভোরে তিনি মন্দিরের চারপাশ ঘুরে ঠিক করে দেন, যেন সে দিন সূর্য্য ঠিক মত পৃথিবী পর্য্যটন করতে পারে।

কিন্তু যতই মানুষ পরিশ্রম করে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করতে লাগল—ততই তারা প্রকৃতির নানা রহস্য জানতে পারল। আদিম কারিকর পাথরে ধার দিতে দিতে ক্রমে সেই পাথরের গুণাগুণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করল। সে শিখে নিল, জোরে ঘা মারলে পাথর ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায় আর ভাঙ্‌বার সময় পাথর চীৎকার করে কান্নাকাটি করে না। কিন্তু পৃথিবীতে তো হরেক রকম পাথর আছে। এটা কথা বলবে না বলেই যে, অন্য পাথরও কথা বলবে না—তার কি মানে?

আমাদের কাছে এখন এসব কথাই হাস্যকর মনে হয়; কিন্তু সেকালের সবাই সত্যি সত্যি এ সব বিশ্বাস করত। তখন ভোজবাজীই ছিল কঠিন সত্য! তারা তখনো প্রকৃতির চালচলনের কোনও সূত্র বা নিয়ম আবিষ্কার করতে শেখে নি বলেই জীবনটাকেই বৈষম্যে-ভরা এক অনিয়মের ইন্দ্রজাল মনে করত! সে দেখত, কোনও দুটো পাথরই এক রকম নয়! তা থেকে তার ধারণা হয় যে, তাহলে সেই সব পাথরের মেজাজও আলাদা হবে!

হাজার হাজার বছর কেটে গেল। ধীরে ধীরে নানা রকম পাথরের কাজ করতে করতে মানুষ সাধারণ পাথরের প্রকৃতি

জানত পারল। সব পাথরই শক্ত; অর্থাৎ পাথর শক্ত জিনিস! কোনও পাথরই কথা বলে না—অর্থাৎ পাথরের বাক্‌শক্তি নেই!

এই ভাবে বিজ্ঞানের প্রথম বীজ উপ্ত হল মানুষের মনে। শীতের পরে যে বসন্ত আসবে এ চিন্তায় আজ আমরা মোটেই অবাক হই না। কারণ আমরা জানি যে, শীতের পর কখনই বসন্ত না এসে হেমন্ত বা অন্য কোনও ঋতু আসতে পারে না। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে এই ঋতু পরিবর্ত্তনের জ্ঞান হচ্ছে বহু হাজার বছরের অভিজ্ঞতার ফলে লব্ধ এক বিরাট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার!

মিশরের লোকেরা নীল নদীর প্লাবন থেকে প্রথমে এই সত্যি আবিষ্কার করে। এক প্লাবন থেকে অন্য প্লাবন পর্য্যন্ত সময়কে তারা এক বৎসর বলে ধরত। নদীকে দেবতা বলে মনে করায় শুধুমাত্র পুরোহিতরাই নদীর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করত। এখনো মিশরের নীল নদীর তীরের বহু মন্দিরের গায় প্লাবন-স্ফীতি মাপবার দাগ রয়েছে।

জুলাই মাসের দারুণ গ্রীষ্মে যখন চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে, খেতখামার পুড়ে যাচ্ছে—তখন চাষীরা অধীর আগ্রহে নীল নদীর প্লাবনের জন্য অপেক্ষা করত। এবারও প্লাবন হবে তো? যদি দেবতা রাগ করে এবার প্লাবন হতে না দেন?

তাই নদীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সবাই নানা উপাচার নিয়ে মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিত। পূজা দেবার পর প্রত্যেক দিন

ভোরে পুরোহিতরা নদীর পারে দেখতে যেত প্লাবন আসছে কি না। প্রত্যেক সন্ধ্যায় তারা ছাদে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। নক্ষত্রখচিত আকাশ ছিল লোকের দিনপঞ্জী! অবশেষে তারা একদিন পূজারীর কাছে এসে জানাত দেবতারা তাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তিন দিনের মধ্যেই জলের ধারা এসে মাঠঘাট ভিজিয়ে দিয়ে যাবে।

খুব ধীরে ধীরে মানুষ তার চারপাশের নতুন জগতকে বুঝতে শিখল! প্রথম নক্ষত্রবিদ্যা আলোচনার ক্ষেত্র ছিল মন্দিরের ছাদ! কামার, কুমোরের কাজের ঘর হল প্রথম ল্যাবরেটরী! মানুষ পর্য্যবেক্ষণ করা শিখল, গুণতে শিখল এবং তা থেকে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে শিখল। তখনকার বিজ্ঞানের উপর যাদুবিদ্যার প্রভাব ছিল পুরোপুরি। পর্য্যবেক্ষণ করে শিক্ষালাভ করলেও মানুষ সেই সঙ্গে দেবতার আরাধনা বাদ দেয় নি। অজ্ঞানতার আরাধনার গহ্বরে ক্রমে ক্রমে আলো এসে পড়ছিল।

দেবতাকুলের স্বর্গযাত্রা

এমন দিন ছিল যখন আদিম অধিবাসীরা প্রত্যেক পাথরে, গাছে, জীবজন্তুতে ভূতপ্রেতের অস্তিত্ব আরোপ করত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই ধারণা বদলাতে লাগল।

প্রত্যেক জন্তুর ভেতর ভূত রয়েছে, পরে আর মানুষ তা ভাবত না। আগের বিভিন্ন ভূতের জায়গায় দেখা দিল একজন অরণ্যরক্ষক দেবতা। চাষীরা আর বিশ্বাস করত না যে প্রত্যেক বিভিন্ন শস্যের ভেতর ভিন্ন ভিন্ন দেবতা আছে। বহু দেবের বদলে শুধু একজন কৃষিদেবী হলেন। তিনিই সব রকম শস্য উৎপাদন করতে সাহায্য করেন।

আগের ভৌতিক আত্মার জায়গা যে সব দেবদেবী গ্রহণ করলেন, তাঁরা আর মানুষের মাঝে কেউ বসবাস করলেন না। জ্ঞানের আলোয় তাঁরা মানুষের আবাস থেকে ক্রমেই দূরে সরে গিয়ে ভীড় জমাতে থাকেন। তাঁরা এমন সব জায়গায় গেলেন যেখানে মানুষ আগে কখনো যায় নি।

কিন্তু এক দিন মানুষ সেখানেও গেল। জ্ঞানের শিখায় গহন বনও আলোকিত হল। পাহাড়ের গা থেকে মেঘের পাল দূরে সরে গেল! তখন এখান থেকেও দেবদেবীরা পালিয়ে গেলেন। তাঁরা আকাশের উপর স্বর্গে কিংবা পাতালের নীচে নরকে জায়গা খুঁজে নিলেন।

ভক্তদের জন্য কেমন করে পৃথিবীতে নেমে এসে দেবতারা সংগ্রাম করেছেন—তার বহু উপাখ্যান রচিত আছে। যখন ভক্ত কোনও রকমে লড়াই জিততে পারছে না—তখন তাঁরাই তাকে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে রেখে শত্রু নিপাত করেছেন।

এই ভাবে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দেবতারাও মানুষের নিকটের জগত ছেড়ে বহুদূরে কাল্পনিক

জগতে চলে গেলেন, নয়তো বহু যুগ আগের ঘটনার উপকথায় রূপান্তরিত হলেন।

আর দেবদেবীর সঙ্গে কাজ চালানোও কঠিন হয়ে উঠ্ল। প্রথমে মানুষ প্রত্যেকেই পূজা, পার্ব্বন, উৎসবাদি বা যাদুর কাজ করতে পারত। সেগুলো ছিলও সহজ। বৃষ্টি নামাতে হলে মুখে জল ভরে নাচতে নাচতে কুল্‌কুচো করে উপরে জল ছুঁড়ে দিলেই হত! এখন মানুষ দেখল এত সহজ উপায়ে বৃষ্টি নামানো যায় না। কাজেই তারা মনে করল দেবতা খুব সহজে মানুষের মনস্কামনা সফল করেন না। ক্রমে পুরোহিতেরা দেবতা আর মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ হয়ে দাঁড়াল। পুরোহিত সব রকম ভোজবিদ্যা ও প্রক্রিয়ায় দেবতার তুষ্টি বিধানের ফন্দিফিকির জানবার ভাণ করত।

আগের ডাইনীরা শুধু শিকারের সময় উৎসবের হোতা ছিল। আসলে তাদের স্থান ছিল গোষ্ঠীর অন্যান্যদের সঙ্গে একই পর্য্যায়ে। ডাইনী বলে দেবতাদের বিশেষ প্রিয় বা উন্নত শ্রেণীর মানুষ ছিল না। কিন্তু পুরোহিতের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি পবিত্রভাবে থাকতেন। তাঁর থাকবার জায়গার পরেই দেবতার আবাস স্থান। তিনি-ই শুধু নক্ষত্র দেখতে পারতেন বলে একমাত্র তাঁরই মন্দিরে উঠে নক্ষত্র দেখবার অধিকার ছিল। যুদ্ধের আগে তিনি-ই নানা লক্ষণ দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন যুদ্ধে জয় হবে কি পরাজয় হবে।

দেবতারা মানুষের কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যেতে

লাগলেন। সে সব দিন অতীতের কথা যখন দেবতারা সমস্ত মানুষকে সমানভাবে ভালবাসতেন। জনসাধারণ নিজেদের জীবন দিয়েই অনুভব করছিল সে সমাজে সাম্যভাব লুপ্ত হয়ে গেছে। পুরোহিতরা তাদের বোঝাল যে, এমনিই হওয়া উচিত। দেবতাদের হাতেই সব কিছু ছেড়ে দেওয়া উচিত। সেনাপতিরা যেমন মানুষ শাসন করে, তেমনি দেবতারা সমস্ত জগত শাসন করেন।

কিন্তু পুরোহিতদের উপদেশ সকলেই নতমস্তকে মেনে নেয় নি। তখনো অনেকেই দেবদেবীর অদৃশ্য শক্তির বশ্যতা স্বীকার করে নি।

এর কিছু পরেই এমন দিন আসবে যখন গ্রীক কবি জিজ্ঞেস করবেন:

"কোথায় জীয়ুসের বিচার? সৎ লোকেরাই কষ্ট পায়, মন্দ লোকে উন্নতি করে! পিতার পাপে সন্তান শাস্তি পাচ্ছে! মানুষের মধ্যে যে একমাত্র দেবী আছেন, সেই আশা দেবীর কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। আর সব দেবদেবীই অলিম্পাস পর্ব্বতে পালিয়ে গেছেন।"

জগতে বাড়ছে

আদিম মানুষের কাছে সত্য, উপকথা, জ্ঞান ও কুসংস্কার এসবের কোনও পার্থক্য ছিল না। কুসংস্কারের হাত থেকে

জ্ঞানের উদ্ধারে হাজার হাজার বছর লেগেছে। যে সমস্ত গাথা বা কাহিনী আমাদের হাতে এসে পড়েছে তার ভেতর কুলের বা কুল-নেতার ইতিহাস থেকে উপকথার অপ্রাকৃত দেবতা ও প্রকৃত বীরদের চিনে বার করা কঠিন। তেমনি উপকথার ভূগোল থেকে আদিম কালের সত্যিকার গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে ধারণা করাও মুস্কিল।

ইলিয়াড ও ওডেসী আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতের মত ইয়োরোপের দুই অমর মহাকাব্য। এই দুই গ্রন্থ থেকে প্রাচীন গ্রীসের উপকথার আমরা নমুনা পাই। তাতে দেখি কেমন করে গ্রীকরা ট্রয় নগরী অবরোধ করে ধ্বংস করে ও কেমন করে পরে একটি গ্রীক কুলের নেতা ইউলিসিস (ওডে-সীয়ুস) বহু দিন নানা সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে অবশেষে নিজের দেশ ইথাকায় ফিরে যান। ট্রয় নগরীর যুদ্ধে দেবতারাও মানুষের পক্ষ নিয়ে লড়াই করেছিলেন। একদল দেবতা যেমন ট্রয়বাসীদের পক্ষে লড়েন তেমনি আর এক দল অবরোধ-কারীদের পক্ষে ছিলেন। কোনও দেবতার আশ্রিত কোনও বীরের মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিলে দেবতারা তাকে সরিয়ে ফেলতেন। অলিম্পাসের চূড়ায় আনন্দ উৎসবে মগ্ন হয়ে দেবতারা আলোচনা করতেন যে, আর বেশীদিন দু পক্ষের লড়াই চালানো ঠিক হবে কিনা!

এই সব অতীতের উপকথার সঙ্গে বাস্তব আর রূপকথার অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয়েছে। এর কতটুকু ইতিহাস আর কতকুই বাটু

রূপকথা ? গ্রীকরা কি কোনও দিন ট্রয়ের প্রাচীরের ভেতর থেকে সংগ্রাম করেছে ? আর ট্রয় ! সত্যিই কি ঐ নামে কোনও শহরের অস্তিত্ব ছিল ?

বহু দিন এ নিয়ে পণ্ডিতদের ভেতর তর্ক চলেছিল। অবশেষে একজন পুরাতাত্ত্বিক এর মীমাংসা করে দেন। ইলিয়াডের নির্দেশ অনুসরণ করে তিনি এশিয়া মাইনরে গিয়ে ট্রয়ের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে পর্য্যবেক্ষণ করে আসেন।

ওডেসীর সবটাই যে রূপকথা নয়—তা ঐ ভাবে প্রমাণিত হয়। পণ্ডিত মহল এই সত্য আবিষ্কার করেন। তাঁরা কাব্যে বর্ণিত ইউলিসিসের ফেরার পথ অনুসরণ করে আবিষ্কার করেন যে, পদ্মমধু খেয়ে থাকার দেশ (Country of the Lotus-eaters) হচ্ছে বর্ত্তমান আফ্রিকার ত্রিপোলীর উপকূল। ইয়োলাস হচ্ছে আধুনিক লিপাস্‌কি দ্বীপ। সীলা ও চেরিব্‌ডিসের মাঝে পড়ে যে ইউলিসিসের জাহাজ ভাঙ্‌বার উপক্রম হয়েছিল—সেই দুটির অবস্থানও এঁরা খুঁজে পান।

ওডেসী যেমন সবটাই রূপকথা নয় তেমনি আবার সবটাই সত্যি মনে করাও ভুল। ভ্রমণ বৃত্তান্তের সঙ্গে জড়িত আছে রূপকথা। পাহাড় হয়েছে দৈত্য—দ্বীপবাসী অসভ্যরা দেখা দিয়েছে এক চক্ষু রাক্ষস হয়ে।

সে যুগের মানুষ শুধু তাদের জন্মস্থানের আশেপাশেরই খোঁজ খবর রাখত ! তাদের মধ্যে যারা বিদেশে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করত, তারাও উপকূল ছেড়ে বেশী দূর যেত না।

কোনও দিক নির্ণয়ের যন্ত্র বা মানচিত্র না থাকায় উন্মুক্ত সাগরের উপর দিয়ে দূর দূর দেশে যাতায়াত ছিল খুবই বিপজ্জনক! সূর্য্য ও নক্ষত্রের অবস্থান থেকে তারা কোনও মতে সমুদ্রে পাড়ি দিত। সমুদ্র গর্ভে লুকানো থাকত হাজারো বিপদ। সামান্য তরঙ্গের আঘাতে পেটমোটা জাহাজগুলো দুলতে থাকত অথই জলের উপর! বড় বড় পালগুলো সামলানো হত কঠিন। ঝড়ের ধাক্কায় ধাক্কায় পারে এসে পৌঁছলে নাবিকেরা সবাই মিলে সেই জাহাজ টেনে মাটিতে তুলত—তখনই ছিল তাদের নিস্তার, তার আগে নয়।

সমুদ্রের চেয়েও বিদেশ ছিল তাদের কাছে বেশী ভয়াবহ। সর্ব্বদা তাদের ভয় হত, এই বুঝি রূপকথার রাক্ষসরা তাদের খেয়ে ফেলবে। যে কোনও নতুন জীবকেই তারা দৈত্য-দানব মনে করে ভয় পেত।

তবু মানুষ সমুদ্রযাত্রা বাদ দেয় নি। প্রত্যেক যাত্রার সঙ্গেই তাদের চোখে পৃথিবীর সীমানা বেড়ে গেছে। রূপকথার দেশের সীমানা এইভাবে সরে যেতে থাকে। সমুদ্র ছাড়িয়ে মহাসাগরে পড়লে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেত। অপার জলরাশির শেষ আছে বলে মনে হত না। তারা প্রত্যেকবার বিদেশ ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেই বলত যে, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়েছিল; আর গোটা পৃথিবীই বিরাট জলরাশি দিয়ে ঘেরা। আরও হাজার হাজার বছর পরে লোকে ইয়োরোপ থেকে ভারত, চীন থেকে ইয়োরোপে যাতায়াত

আরম্ভ করে। নাবিকরা মহাসাগর পাড়ি দিয়ে দেখে যে তার এপারেও ঠিক তেমনই লোকজন বসতি-বহুল দেশ আছে কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে রূপকথার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আরও বহুকাল চলেছিল।

আবিষ্কারক কলম্বাসের ধারণা ছিল যে, আমেরিকার এক পাহাড়ের চূড়ায় হচ্ছে স্বর্গ! তিনি স্পেনের সম্রাজ্ঞীকে চিঠি লিখে জানালেন, সেই স্বর্গের আশে পাশের জায়গা ও আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করার ইচ্ছা তাঁর আছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর রাশিয়ার লোকেরও ধারণা ছিল যে, উরাল পর্ব্বতের ওপরের লোকেরা সারা শীতকালে ভালুকের মত শুধু ঘুমিয়ে থাকে! অনেক পুরানো হস্তলিপি পাওয়া গেছে। এর নাম "পূর্ব্বাঞ্চলের অদ্ভুত লোক!" তার মধ্যে মস্তকহীন (কবন্ধ), মুখহীন ও বুকের ভেতর চোখওয়ালা নানান রকমের মানুষের বর্ণনা আছে। এ সমস্তই আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হয়, কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই, আমরা এখনও অল্প বিস্তর এই রকম ভুল করে থাকি। এখনো আমাদের অনেকের ধারণা এই যে, চন্দ্রলোকে ও বুধ গ্রহে নানা কাল্পনিক অদ্ভুত জীবের বসবাস আছে। এককালে অদ্ভুত জীবজন্তুর অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে বলে আমরা মনে করতাম। আজ জ্ঞানের দুর্ব্বার আলোক শিখায় সেই অন্ধকার দূরে গিয়ে মানুষ যেন মুস্কিলে পড়েছে। তাই অনেকে সেকালের কাল্পনিক কিম্ভূতকিমাকার জীব এখন

অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহে রয়েছে ভেবে যেন সান্ত্বনা পেতে চায়।

প্রথম কবি

প্রত্যেক যুগেই মানুষ রহস্যের হাত থেকে কিছু না কিছু মুক্তি পেয়েছে। কারিকর ক্রমে নিজের শক্তিতে বিশ্বাস করতে শিখেছে। কাজের সময় সে আর বড় একটা মন্ত্র পড়ত না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকার কেটে যায় তেমনি ধীরে ধীরে মানুষের জীবন থেকে যাদুবিদ্যার প্রভাবও কেটে গেল।

গ্রীসের চাষীরা আগে ফল-দেবতা ডিয়োনীসাসের আরাধনার জন্যে নানান খেলা-ধুলার আয়োজন করত। সেই দলবল মিলে নাচ গান করত, নৃত্যগীতে দেখান হত ডিয়োনীসাসের মৃত্যু, তাঁর পুনর্জ্জীবন, শীতকাল চলে গেলে আবার কি করে তিনি পৃথিবীকে ফলফুলে সজ্জিত করে তোলেন। জীবজন্তুর মুখোস পরে লোকে মন্দির ইত্যাদির সামনে নাচত। একজন ডিয়োনীসাসের কাহিনী আগে বলে যেত, অন্যেরা তারই সঙ্গে দোঁহা দিত।

পুরাকালের সেই সম্মোহন ক্রীড়া অনেকটা সাধারণ খেলার মত। খেলার নেতা যে শুধু দেবদেবীর সুখ-দুঃখের গানই করত তা নয়, অঙ্গভঙ্গী দিয়ে সেগুলো বোঝাবার চেষ্টা করত। বুক চাপড়ে, কেঁদে, আকাশের দিকে হাত তুলে

তারা মনের নানান ভাব প্রকাশ করত! এঁরাই ছিলেন ভবিষ্যতের নট-নটীদের পূর্ব্বপুরুষ।

কয়েক শতাব্দী কেটে গেলে এই যাদুবিদ্যার ক্রিয়া প্রক্রিয়া থেকে যাদুর অংশ লোপ পায়। রইল শুধু খেলাটাই! আগের মতই লোকে নাচত, গাইত, কিন্তু চারণেরা আর দেবতাদের কথা বলত না। এখন তারা নিজেদেরই সুখ দুঃখের গাথা গেয়ে বেড়াত! তাদের সঙ্গে দর্শকরাও হাসি কান্নায় যোগ দিয়ে আমোদ করত।

নায়ক যে শুধু প্রধান অভিনেতা তাই নয়, সে প্রথম কবিও বটে। গোড়ার দিকে সে শুধু দলবদ্ধ ভাবে গাইত কিন্তু ক্রমে সে একাও গান করত।

তার গানের বিষয়বস্তু ছিল দেবদেবী, মহিলা ও বীর-পুরুষদের বীরত্বের কাহিনী। এ সব গান ঠিক স্তব-স্তুতির পর্য্যায়ে পড়ে না। মানুষের বীরত্বের কাহিনী গেয়ে অন্যকে অনুপ্রাণিত করাই ছিল এই গাথার উদ্দেশ্য।

তাহলে প্রেমের গান কোথা থেকে এল? প্রেমের গানের জন্ম হল বিবাহ, কিংবা ফসল ভোগের উৎসব ইত্যাদি থেকে! এ সমস্ত উৎসবে গায়কদল ছোট ছোট গান করত। মেয়েরা চরকা নিয়ে বসে কিংবা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কাঁখে করে সেই গানের দোঁহা ধরত!

কে যে প্রথম প্রেমের গান কিংবা বীরত্বের গানের রচনা করেন—তা আমাদের অজ্ঞাত! একজন নয় বলাই বাহুল্য।

শত শত যুগের শত সহস্র কবির ও শ্রোতার ভেতর দিয়ে শুধু সমস্ত গান ও গাথা রূপ পরিগ্রহ করেছে। গায়কের হাত থেকে গায়কের হাতে চলতে চলতে বহু গাথার রূপান্তর হয়! নদী যেমন নানা ছোট ছোট জলস্রোতের সমষ্টি থেকে উদ্ভূত হয়—তেমনি আধুনিক কবিতাও ঐ সব গানের ভেতর থেকে জন্ম নিয়েছে।

আমরা সচরাচর বলে থাকি, হোমার ইলিয়াড লিখেছেন। কিন্তু তিনিই কি একা সব লিখেছেন ?

বীরত্বের গাথা যখন রচনা করল সেই প্রথম অবস্থায় মানুষ গোষ্ঠীগত ভাবে কাজ করত। কাজেই গানের ভেতর গোষ্ঠীর সকলেরই কিছু না কিছু অবদান ছিল। গায়ক সম্পূর্ণ গানের অদল-বদল করলেও তখনো মনে করত না যে, সেই গান তৈরী করেছে!

কিন্তু আরও পরে মানুষ ভালো করে আত্মপর ভেদাভেদ শিখল। গোষ্ঠীপ্রথা তখন ভেঙে যাচ্ছিল। আগের ঐক্য ও সাম্য আর ছিল না! কারিকর নিজের খুশিমত কাজ করত। গোষ্ঠীর অনুগত দাস বলে সে আর নিজেকে মনে করত না।

কয়েক শতাব্দী পরে গ্রীক কবি থিয়োগ্নিস বললেন: "আমার হাতের অক্ষয় ছাপ এঁকে দিয়েছি এই কবিতায়—এ সৃষ্টি আমার—আমারই শিল্পের, কেউ যেন একে চুরি করে তাঁর বলে দাবী না করে—সকলেই বলবে—এগুলো মেগারার কবি থিয়োগ্নিসের আপন মনের গোপন গাথা।"

গোষ্ঠীপ্রথার সময় কেউ এ ভাবে লিখতেই পারত না। মানুষ ক্রমেই বেশী করে "আমি" শব্দটির ব্যবহার করতে থাকে। মানুষ যে নিজে কিছু করছে না—দেবতা তাকে দিয়ে সব করিয়ে নিচ্ছেন—সে যুগ অতীতের মধ্যে চলে গেছে। এখনকার কবি যদিও বলেন যে কাব্যদেবী তাকে উদ্দীপিত করেছেন তবু নিজেকে তিনি কাব্যসৃষ্টি থেকে কখনই সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চলেন না—চলতে পারেন না।

"কাব্যদেবী আমায় জাগিয়েছেন—আমি অমর হব।"

গ্রীসের মহিলা কবি শ্যাফোর এই কবিতায় অতীত ও বর্ত্তমান মনোভাবের সংমিশ্রণ হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে ভাগ্য দেবীই তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেবেন—কি লেখা উচিৎ। সেই লেখার ভেতর আবার দেখি তাঁরও অমর হবার আকাঙ্খা। আধুনিক যুগের মিলটন ও মধুসূদনের কাব্যও আমরা এমনি "আমি" ও "তিনি"র মেশামিশি দেখতে পাই।

এই ভাবে মানুষ বাড়ছে। আবার সে যতই বাড়ছে তার চার পাশের জগতের পরিসরও ততই বেড়ে চলেছে।